

ঘৰে কুন্তলা

সুজি

নামিয়া পাতুল



যখন ক্রীতদাস : স্মৃতি '৭১

নাজিম মাহমুদ

মুক্তধাৰা



মুক্তধারা ১৬১৬

প্রকাশক

চিত্তরঞ্জন সাহা

প্রধান পরিচালক

মুক্তধারা।

[স্বঃ পুষ্পিঘর লিমিটেড]

৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

ফোন ২৩১৩৭৪, ২৩৫৩৩৩৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পিউটার কম্পোজ

বিদ্যসাহিত্য কেন্দ্র ঢাকা

মুদ্রাকর

প্রভাস্তুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

স্বত্ত্ব : সীআ মাহমুদ ও

মুজতবা হাকিম প্লেটো

JAKHAN KRITADAS : SMRITI '71

[Memoirs]

By Nazim Mahmood

Second Edition February 1995

Cover design : Quayuni Choudhury

Publisher C. R. Saha

MUKTADHARA

Prop. Puthighar Ltd.]

74 Farashganj Dhaka 1100

Bangladesh

Price: Taka 80.00

একান্তরের নিভীক সঙ্গী ।
প্রয়াত শ্রী
জেবুন্নিসা সুরণে

নিবেদন : দ্বিতীয় প্রকাশ

শ্রীকান্তজ্ঞন শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহার বিশেষ আগ্রহে এই প্রকাশনা। তাহারা দিভিন্ন পত্র
পত্রিকায় বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচকদের অকৃষ্ট প্রশংসন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং নতুন
কিছু সংযোজনে উৎসাহিত। তবুও মনে হচ্ছে, কত কথাই যে এখনো না-বলা।

নাজিম মাহমুদ

সূত্র লেখ

একাত্তর আমাদের শ্রেষ্ঠ বছর : আমাদের গগচেতনা সংগ্রাম ও গোরব উদ্দিষ্ট কাল, যদিও গণহত্যা ধর্ষণ নির্যাতন ও সহস্র সৎকাটে এই ভয়াবহ কালখণ্ড আমাদের দৃঃষ্টিপুর্ণ, আমাদের কালরাত্রি।

অন্যদিকে স্বদেশ, স্বজন ও স্বকালের সাথে আমাদের কিছু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় একাত্তর কলঙ্কলিপ্ত। ওই সময়ে গোপন গত ফুড়ে আত্মপ্রকাশ করে পিঠে নামাবলী আলবদর-বাজাকার-আল শামস-শাস্তি কমিটির নরঘাতক দল।

ঘটনাচক্রে কয়েক কোটি হতভাগ্য মানুষের সাথে বন্দীশিবির বাঙলাদেশে কাটে আমার একাত্তরের দিনরাত্রি। বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নামক এক বধ্যভূমি ও সেনানিবাস ছিল আমাদের কর্মস্থান। উনিশ বছর পদ্মাৰ প্ৰবল জলস্নোতে প্রায় বিলুপ্ত সেই দৃঃষ্টিপুর্ণ স্মৃতি, তবুও কেউ ভোলে না কেউ ভোলে তার মায়ের অসম্মান।

‘একাত্তর : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা’ গ্রন্থের জন্য সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের অনুরোধ জানালেন অনুজপ্রতিম বন্ধু কথাশিল্পী রশীদ হায়দার। স্মৃতিসমূহে সেই একটুকু ছোওয়াতেই দৃঃসহ হয়ে পড়লো অপ্রকাশের ভার। এই হলো বৰ্তমান গ্রন্থ রচনার পটভূমি।

শুধু অপ্রকাশের ভারমুক্ত হবার চেষ্টা নয়, এই গ্রন্থ রচনার পিছনে মুক্তিযুক্তের চেতনা সচেতন দুই তরুণের তাড়াও ছিল প্রচণ্ড। তাদের একজন আমার পুত্র মুজতবা হাকিম প্লেটো এবং অন্যজন আমার ভাগী-পুত্র শিল্পী কারু তিতাস।

গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে বন্ধু প্রকাশক গোলাম মোস্তফা, পরম স্বেচ্ছাজন কবি মোহাম্মদ কামাল, আবস্তিকার জ্যোতি রায়, শিল্পী মাসদুল হক, মুমু কম্পিউটারস্‌ স্বজ্ঞাধিকারী রূবেল, অধ্যাপক মুজাফিজুর রহমান, কন্যা রীআ মাহমুদ ও কল্যাণীয়া জ্ঞোবায়দা খন্দকার হাসির উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন।

স্মৃতিচারণে দু একটি হারানো সূত্র ধরিয়ে দিয়ে যে অধ্যাপক বন্ধুরা বিশেষ কৃতস্বত্ত্বাভাজন, তাঁরা হলেন আতফুল হাই শিবলী, বজলুল মোবিন চৌধুরী, আবদুল খালেক, সনৎ কুমার সাহা, সুব্রত মজুমদার, শহিদুল ইসলাম, শিশির কুমার ভট্টাচার্য ও জাহেদুল হক টুকু। এই স্মারক তালিকায় আরো আছেন আমার শ্রী-অনুজ্ঞা নুরনেসা নূরী, ভাজার নুরজ্জামান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বন্ধু আবদুল মাল্লান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সর্বজনোব আবুল বাশার, মতিউর রহমান, আলতাফ হেসেন ও আবদুল আজিজ।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জনসংযোগ দফতর ও শহীদ স্মৃতি সংগ্ৰহশালার গ্রন্থ ও সংবাদপত্র ব্যবহারে সুযোগ দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্বেচ্ছাজন ফারুক আহমদ, আহমদ সফিউদ্দিন ও মনসুর আহমদ খানের কাছে আমি ঝণী।

পরিশেষে, শেষ প্রচন্দে উৎকীর্ণ গ্রন্থ-পৰিচিতি লিখে এবং অজন্ম পৰামৰ্শ দিয়ে চিরদিনের অভ্যেস মতো আমার উপকার করলেন স্বনামধন্য কথাশিল্পী বন্ধু হ্যাসান আজিজুল হক।

সকলের কাছেই আমার ঝণ অশ্রে ও অপরিশোধ্য।
দুনিয়ার প্রাথক এক হও! ~ www.amharboi.com ~

ଲେଖକେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହୁ :

ଚେତନାର ସୈକତେ (ସ୍ଵରଳିପିସହ ଗଣସଂଗୀତ)

ଭାଲୋବାସାର କଥା (କବିତା)

ଉଜ୍ଜୀର ଘୋଡ଼ାର ଗମ୍ଭୋ-(ନ୍ୟୂଟକ)

ଦୁନ୍ୟାର ଶୀଘ୍ରକ ଏକ ହୋ! ~ www.amarboi.com ~

বাঞ্ছলা ভাষার প্রতি আমাদের দেশপ্রেমিক বুজু়িবীদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সেদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন ডেইন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। আমার মনে আছে, একাত্তর সালের ফেরুজআরি প্রথম সপ্তাহের কোনো এক সক্ষেত্রে কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয়টি আমাদের আলোচনায় এসে পড়ে। ডঃ হোসায়েন তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চাম্পেলর এবং আমি সেখানে জনসংযোগ কর্মকর্তা। আমাদের দুজনের মধ্যে আরো একটি সম্পর্ক ছিল। ডঃ হোসায়েন আমার লিঙ্কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে আমাদের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদানের পর আমাদের পারম্পরিক সম্পর্কে নতুন গিট পড়লেও একজন প্রাক্তন ছাত্রের কাছে তিনি মন খুলেই কথা বলতেন।

ডঃ হোসায়েন বলছিলেন : আমার সম্পর্কে তোমরা কত কি ভাবো। তোমরা মনে করো আমি বাঞ্ছলা বিদ্রোহী, অর্থচ জানো, আমার ছেলেমেয়েদের আমি কখনো কিপারগাটেন অথবা কোনো ইংরেজী স্কুলে পড়তে পাঠাইনি। অন্যদিকে আন্তঃঃ এক ডজন দেশপ্রেমিক বুজু়িবী ও জননেতার নাম আমি করতে পারি যারা তাদের সন্তানদের মাতৃভাষার অক্ষর পর্যন্ত শেখাবার চেষ্টা করেননি। ছেলেমেয়ে বড় হতে না হতেই বরং শিক্ষার জন্য তাদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছে।

এই বক্তব্যের প্রমাণ দেখিয়ে অনেক তথ্য পাড়লেন ডঃ হোসায়েন। কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র কিংবা ছাত্রী ছিল এবং তখন সেই ছেলেমেয়েরা বাঞ্ছলা লিখতে পড়তে এবং সহজভাবে বলতে পারতো কি পারতো না ইত্যাদি কথা আর কি। এমন সব বেদনাদায়ক অবিস্মাস্য তথ্য যে যতটা আমি অবাক, তারো বেশী মনে মনে কষ পেলাম। ইংরেজীতে মাস্টার্স ডিগ্রি নেবার আগে কোনো দেশবরণে ভাষাবিদ বাঞ্ছলার সাধকের পোত্রী বাঞ্ছলা বর্ণমালা উল্টে দেখবেন না, এমন কথা শুনবো ভাবিনি। আমাদের বুজু়িবী ও জননেতাদের চরিত্রের এই স্ববিরোধিতা হ্যত এখনও তেমনি আছে। হ্যত এখনো এমন অনেকে আছেন যারা বাঞ্ছলা ভাষা শিক্ষায় তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। মাতৃভাষায় তাঁদের সন্তানেরা জ্ঞানলাভ না করলেও তাঁদের কোন খেদ নেই, বরং ইংরেজী ফরাসী ভাষায় ছেলেমেয়েদের অনায়াস স্বাক্ষর্দ্দন তাঁদের এক ধরনের অঙ্কোর ও আনন্দ। কিন্তু সেই উন্নস্তর-উন্নতরকাল একাত্তরে আমাদের বুজু়িবীদের চরিত্রে এ রকম স্ববিরোধিতার কথা শোনায় যেন ঠিক প্রকৃত ছিলাম না। গণ আন্দোলনের উত্তাপ রক্ষে তখনও টাটকা। কি যেন এক দায়িত্ববোধ তখনো মনকে নাড়া দেয়। আর তাহাড়া ফেরুজআরি মাসে ঐতিহাসিক কারপেই আমাদের মগজ একটু সজাগ থাকে। তাই হঠাতে আমার মনে হলো, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বাঞ্ছলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ নিলে কেমন হ্য।

ডঃ হোসায়েনকে আমি সবিনয়ে বললাম : ‘স্যার, এদেশে আপনি এক বিতর্কিত

ব্যক্তি। সবাই ভাবে, আপনি বাঙলা বিশ্বোধী। আপনি যখন তা নন, আপনার সম্পর্কে অহেতুক সকলের এই ভূল ধারণা আপনার ভেঙে দেওয়া উচিত।'

'কেমন করে?'

'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা আপনি। এখানকার প্রশাসনে বাঙলা ভাষা চালু করুন।'

আমার প্রস্তাব নিশ্চয়ই ডঃ হোসায়েনের মনে ধরলো। তৎক্ষণাতে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন এবং প্রশাসনে ব্যবহৃত কিছু কিছু ইংরেজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ উদ্ঘাবন করতে লাগলেন। তখনই স্থির হয়ে গেল, এক সাংবাদিক সম্মেলন দেকে ঘোষণা দেওয়া হবে যে আসছে একশে ফেড্রুআরি থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সব কাজকর্ম বাঙলায় চলবে। কদিন ধরে পরিভাষার কাজে ব্যস্ত রইলেন ডঃ হোসায়েন। কখনো কখনো আমাকে দেকে দুঃকৃটি শব্দ সম্পর্কে আমার মতামত জিজ্ঞেস করলেন। তারপর যেদিন সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, ভাইস চাম্পেল ভবনের লাউঞ্জে সেদিন সে কি উদ্বীপনা! কিছু নমুনা পরিভাষা সম্বলিত সাইক্লোস্টাইল করা একটি কাগজ প্রত্যেক সাংবাদিকের হাতে দিলেন ডঃ হোসায়েন। এত বড় সাংবাদিক সম্মেলন তার আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো হয়নি। একাত্তর সালের আঠারোই ফেড্রুআরি থেকে একশে ফেড্রুআরির মধ্যে পাকিস্তান অবজারভার, মণিৎ নিউজ, দি পিপল, দি সান, ইন্টেফাক, পূর্বদেশ, আজাদ, সংবাদ, সংগ্রাম, সোনার দেশ, রাজশাহী বার্তা ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে খুব ফলাফলে করে খবরটি বের হলো। চারদিকে ধ্বন্যধন্য। কোনো কোনো পত্রিকার মন্তব্যের কলামে অথবা সম্পাদকীয় স্তম্ভে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বাঙলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগকে এক প্রশংসনীয় ও বিলম্ব পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হলো। উনিশে ফেড্রুআরি সংখ্যার আজাদে আট কলাম ব্যাপী এক শিরোনাম ছিল—“বাংলা প্রচলনঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।” সেখানে দীর্ঘ মন্তব্যের এক স্থানে বলা হয় : “রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পর্কে আনেক দুর্নাম অতীতে শোনা গিয়াছে। তিনি সর্বস্তরে বাঙলা ব্যবহার ও প্রচলনের বিশ্বেতাও করেছেন। সেই ব্যক্তি আজ গণদাবীর সম্মুখে নতি স্থীকার করে যে প্রশংসনীয় মহান উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য কি মান হয়ে যায়নি?”

গণদাবীর মুখে ডঃ হোসায়েন যে নতি স্থীকার করে থাকেন, তার একটি দৃষ্টান্ত অবশ্য আগেই পাওয়া গেছে শহীদ শামসুজ্জাহ হলের নামকরণে। ডঃ শামসুজ্জাহের নামে ‘শহীদ’ শব্দটি যুক্ত করায় তাঁর আপোন্তি ছিল প্রবল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দুদিন আগেও এ ব্যাপারে তিনি অনুড় : ‘শহীদ কাকে বলে?’ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্রনেতৃত্বন্দ এবং আবু সাইদ ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ কতিপয় অগ্নিবরী শিক্ষকের তৎপরতায় ডঃ হোসায়েন মত পরিবর্তন করলেন। রাতারাতি প্রস্তর ফলক সংশোধিত হয়ে ‘শহীদ’ শব্দটি ধারণ করলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা ভাষার বিষয়ে ওই সিদ্ধান্ত নেবার ফলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের প্রশাসনে অবিলম্বে বাঙলা প্রচলনের ঘোষণা দিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যে অগ্রণী, তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো। দি পিপল এর উনিশে ফেড্রুআরি সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোনামই ছিল Rajshahi University's Bold Lead.

ফেড্রুআরি শেষ সন্তানে ডঃ হোসায়েন একবার ঢাকা ঘুরে এসে আমাকে দেকে বাঙলা

ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। ডঃ হোসায়েন বললেন : 'জানো, মুনীর চৌধুরী পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের বলেছেন - Rajshahi University has stolen a march over yours. আমার দারক্ষ ভালো লাগলো। ছাত্রজীবনে ডঃ হোসায়েনকে ভয় করতাম খউব। তাঁর ধন্যবাদ পাওয়া মানে আকাশের ঠাঁচ পড়লো হাতে। ডঃ হোসায়েন হয়ত বুঝেছিলেন, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এই সম্মান সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি বদলে দেবে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর মতাদর্শ তখন হয়ত পালটে যাইছিল, কে জানে। যেমন এই ঘটনার কিছুদিন আগে যশোরের সাগরদাঁড়ির মধুমেলায় এবং নওয়াপাড়া কলেজের অনুষ্ঠানে উদার মানবতা ও মুক্তবুদ্ধির পক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন এবং সকল মানুষকে সবরকম সংকীর্ণতা ও গোড়ার্মী পরিহার করার আহবান জানান। তাছাড়া সত্ত্বের সালের উনিশে জানুআরি রংপুর কারমাইকেল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে প্রদানের জন্য পুস্তিকায় তাঁর ভাষণ ইংরেজিতে মুদ্রিত হলেও শেষ মুহূর্তে সেই ভাষণের তিনি বাংলা তর্জমা করেন এবং সমস্ত রাত জেগে স্টেনসিলে আঘি হাতে লিখি সেই অনুবাদ। ইংরেজী ভাষণের সাথে সাথে বাংলা অনুবাদের সাইক্লোস্টাইল করা কপিও সম্বর্তনে বিতরণ করা হয়। ডঃ হোসায়েন বাংলায় ভাষণ দেন। তারপর পঁচিশে জানুআরি খুলনায় বি এল কলেজে এবং উনিশে ও একত্রিশে জানুআরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন আয়োজিত হলো। সবখানেই ভাইস চাস্পেল ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাষণ ছিল বাংলায়। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বাংলা ভাষা চালু করার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে অর্থাৎ একাত্তর সালে নেওয়া হয়, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর। এ ব্যাপারে আমাদের ছিল কেবল পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা। কিন্তু কি আশুভা রাজনৈতিক হাওয়া বদলের সাথে সাথে ডঃ হোসায়েন যেন ফিরে গেলেন তাঁর পূর্ব অবস্থানে। আজাদ এর ভাষ্যকার লিখেছিলেন 'গণদাবীর সম্মুখে তিনি নতি স্বীকার করেছেন'। হয়ত তাই। হয়ত তাঁর আদর্শগত তাগিদ ছিল না। তাই পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সাথে একেবারে একাত্ম হয়ে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত লাগেনি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সমর্থন ও লঙ্ঘনের মাটিতে দাঁড়িয়েও জল্লাদ বাহিনী দুর্বর্ক সম্পর্কে তাঁর সাফাই কর্তৃ মৃত্যুর ভয়ে আর কর্তৃ অন্তরের তাগিদে, তা নিশ্চয় বলা কঠিন।

হঠাতে আটাশে ফেরুআরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তেসরা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ স্থগিত করলেন। পরিষদে নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সংশয় দেখা দিল। সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষেত্রে ও উচ্চেজনায় ফেটে পড়তে চায়। গণতন্ত্রের সাথে এতবড় অন্যায় এতবড় বেষ্টমানি অসহ্য। পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হতেই চারদিকে বিক্ষেপ মিছিল সংহর্ষ এবং কোথাও কোথাও চরম অরাজকতা শুরু হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পর্যন্ত এক মুহূর্তে পশু। এই বেষ্টমানি বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিলেন না শেখ মুজিব। দোসরা মার্চ ঢাকায় হয়তাল হলো। তেসরা মার্চ প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। ওইদিন রাজশাহী টেলিফোন একস্তেঞ্চের সামনে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলো একটি বালক। বিভিন্ন স্থানে সামরিক তৎপরতা শুরু হতেই এলো সাতই মার্চ। অবশেষে রেসকোর্সের বিশাল জনসমূহে বাংলালির যুগ্মণ বাহিত অব্যক্ত কথাটি উচ্চারিত হলো : এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ওই মার্টের প্রথম সপ্তাহেই সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক খালিদ হসান একদিন আমার দফতরে এলেন, হাতে দু'এক বাণিল একশ টাকার নেট। তাসের মতো টাকাগুলি সশব্দে একটু ভেজে তিনি জানালেন ব্যাংকে গাছিত তাঁর সব টাকা তুলে নিয়ে তিনি বাজারে সোনা কিনতে যাচ্ছেন। হঠাৎ সোনা কেনাকিনি কেন, আমার মাথায় কিছুই এলো না। খুব বাহুদূরি ঢঙে খালিদ হসান বললেন, ‘আরে মশাই, একমাস পর এই নেটগুলির কোন দাম নাও থাকতে পারে, এমন কি এসব নেট বাতিল হতে পারে।’

‘মানে?’

‘মানে হাওয়া কোন দিকে, পাকিস্তানের হল কি হয় কে জানে। প্রচণ্ড একটা ঝড় তো হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

‘তাঁ সোনা কিনছেন কেন?’

‘কখন কোথায় ধাকি, তাঁর ঠিক আছে? তাই সোনা কিনে রাখাই ভালো, কারণ সোনা সবসময়ে সবখানেই বেচা যাবে।’

খালিদ হসানের মতো অনেকেই হয়ত তখন এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন। কিন্তু কজন আগেভাবে সতর্ক হবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের প্রোতোধারণাটি সঠিকভাবেই লক্ষ করেছিলেন খালিদ হসান। যথাসময়ে তিনি যেমন একজন সৈনিকের মতো শ্বাধীনতার সপক্ষে রাইফেল তুলে নেন, তেমনি যথাসময়ে সীমান্ত পার হয়ে তিনি চলেও যান। বন্দীশিবিরে বোকার মতো ধরা দেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকুরীর বয়স তখন মাত্র দু বছর। তবুও অনেকের সাথেই আমার যোগাযোগ। ছাত্রজীবনের অনেক শিক্ষণ ও সতীর্থকে এখানে ফিরে পাই। তাছাড়া পূর্বতন পেশা সাংবাদিকতা ও সম্প্রতিকল্পনা সূত্রে অনেকেই ছিলেন আমার কাছের মানুষ। আমার অফিসে অনেকেই নিয়মিত আসতেন, দুণ্ড গল্প করে চলে যেতেন। সেই সব টুকরো টুকরো গল্পে কথায় রাজনৈতিক হালচালের কত রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতো এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহের ক্তরক্তি সম্ভাবনার ইঁহিগত স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু সব আলোচনাই যেন এক এক সময়ে নিষ্ফল কসরৎ বলে ভাবতাম। আসলেই কি এমনটি হতে পারে? রাজনৈতিক বাতাস যতই এলোমেলো ছুটুক না কেন, মনের কোথায় যেন এক গভীর বিশ্বাস, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে মাত্র গুটিকয়েক সেপাই অস্ত্র ধরবে? অসম্ভব। এত সাহস নিশ্চয় ওদের নেই, হতেই পারে না। তাছাড়া একান্তরের প্রথম খেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একের পর এক যে নাটক করে গেলেন, তা শুধু আমাকেই নয়, গোটা দেশবাসীকে, এমন কি নেতৃদেরও কিছুটা যে বিভ্রান্ত করেনি, তাতো নয়।

এগারোই জানুଆরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি আশাবাদী। বারোই জানুଆরি শেখ মুজিবের সাথে রূপ্তান্তর বৈঠকে বসলেন তিনি। বৈঠক শেষে ঘোষণা ছিল ‘আলোচনা সম্মোহনক’। চৌদ্দই জানুଆরি বহুস্মিন্তিবার বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আরো সুস্পষ্ট ঘোষণা : ‘মুজিব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।’ এই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া লারকানা গেলেন সতেরোই জানুଆরি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভট্টোর সাথে তাঁর সুরম্য বাসভবন আল-মুরতাজা প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে করতে অন্য কথা ভাবলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। ‘মুজিব ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী’ তাঁর এই পূর্ব ঘোষণার একটি ব্যাখ্যাও তিনি ভেবে নিলেন মনে মনে।

আঠারোই জ্ঞানাবি তিনি বললেন, অনিচ্ছ্যতা শিগগিরই দূর হতে যাচ্ছে। তাত্ত্ব বটেই। কিন্তু আমরা কি তাঁর মনের কথা একটুও আঁচ করতে পেরেছিলাম? সাতাশে জ্ঞানাবি বৃথাবার থেকে মুজিব-ভুট্টোর দফার পর দফা সমঝোতাপূর্ণ বৈঠক চললো। জ্ঞাতীয় পরিষদ আহবানের জন্য মুজিব প্রচণ্ড চাপ দিলেন এবং পনেরোই ফেড্রুআবি সর্বশেষ তাঁরিখ নির্ধারণ করলেন। ওদিকে এগারোই ফেড্রুআবি রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক কর্তা ব্যক্তিদের সাথে এক দীর্ঘ আলোচনায় বসলেন ভুট্টো। দুদিন পর সরকারী ঘোষণা এলো—তেসরা মার্চ অধিবেশন। সাতাশে ফেড্রুআবি থেকে আবার পি. আই. এ. বিমানে সাতাশ বেলুচ ও তেরো ফুটিয়ার ফোর্সের পদাতিক সৈন্যরা শাদা পোশাকে ঢাকায় আসতে শুরু করলো। ভারতীয় ফকর হাইজ্যাকের ঘটনার ফলাফলে পশ্চিম-পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-পথ তখন যদিও দীর্ঘতর হয়ে গেছে, তাতে কি। এভাবেই রীতিনীতি ভেঙে সামরিক তৎপরতায় ব্যবহার করা হলো বেসামরিক বিমান। সমস্ত আটাটো বৈধে তারপর একদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা দিলেন, জ্ঞাতীয় পরিষদ স্থগিত।

ইয়াহিয়ার লীলার কিন্তু তখনই শেষ নয়। প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় এবং দলমত নির্বিশেষে বিকৃত বাঙালির অসহযোগ আন্দোলনের মুখে নতুন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিলেন তিনি। ঢাকা তখন কালো পতাকার শহর। শুধু ঢাকা কেন, সারা দেশেই কালো পতাকা উড়ছে। চৌদ্দই মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো বললেন : ‘দু দলের কাছে ক্রমতা হস্তান্তর করা হোক।’ তার মানে কি? পনেরোই মার্চ সোমবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এলেন। ভুট্টোও এলেন একুশে মার্চ, সঙ্গে চৌদ্দজন সঙ্গী। একই সঙ্গে চললো অসহযোগ আন্দোলন এবং দফায় দফায় আলোচনা। এক ফাঁকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রতিক্রিতি দিলেন—‘পঁচিশে মার্চে সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ হায়েরে! স্যাসেল তিনি কি বলেছিলেন আর আমরা কি বুঝেছিলাম! তেইশে মার্চ শেখ মুজিবের ধারণমণি বাসত্বনে পাকিস্তানের জ্ঞাতীয় পতাকা পুড়িয়ে বাঙালিদেশের পতাকা উড়ান্তে হলো এবং সেইসঙ্গে শতশত কঠে গান—‘আমার সোনার বাঙালি আমি তোমায় ভালোবাসি।’ অন্যদিকে প্রদেশব্যাপী সামরিক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক বিমানে শাদা পোশাকে বিভিন্ন বাহিনীর সৈন্য আনার প্রক্রিয়াও অব্যাহত। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক নেতৃত্বন্দের ছলচাতুরীর শিকার হয়ে শেষ মুহূর্তে একবস্ত্রে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে আমাদের নেতারা যেখানে পলাতক হলেন, সেখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সুন্দর উদ্যানে বাস করে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ তখন আমরা কতটা ভাবতে পারি! আমাদের এই সবুজ মাঠ যে নবর্ষাপদের বিষাক্ত আক্রমণে অচিরাত্ ব্যাহুমিতে পরিণত হবে, তা কে জানতো।

শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ঘোষণায় আমরা তখন দাকুণ উদ্বীপ্ত। অসহযোগ আন্দোলনে এক কাতারে শামিল সকল শ্রেণীর বিকৃত মানুষ। গভীর প্রত্যয় আমাদের বুকে, অক্ষণদিনেই অন্যায়ে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের স্বাধিকার। দেশের সমস্ত মানুষ যখন হিমালয়ের মতো জ্বাগত, তখন কে রোখে তাকে! এক পর্যায়ে পাকিস্তানী খেতাব বর্জন শুরু হলো। ভাইস চাম্পেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও একটি পাকিস্তানী খেতাবের অধিকারী। তাই আমি সেটা তাঁকে সুবৃগ্ন করিয়ে অনুরোধ জ্ঞানালাম :

‘স্যার, এ সময়ে আপনারও খেতাব বর্জন করা বোধহ্য ঠিক হবে।’

ডঃ হোসায়েন আমাকে আস্বস্ত করলেন : ‘নিশ্চয়ই। তবে এ বিষয়ে শেখ নির্দেশ দিলেই করা সঠিক হবে। তাঁর সাথে আমি যোগাযোগ রাখছি।’

আমি নিশ্চিত হলাম। কোনো ব্যাপারেই আমাদের পিছিয়ে পড়া চলবে না। রাজশাহী
থেকে যতদূরেই অবস্থান হোক না কেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ব্যাপারে অগ্রণী
ভূমিকা নিতে পারে, এজন্যে আমাদের বেশ একটু গর্ভ ছিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ আসলেই তখন বেশ শক্তিশালী ও সংবচ্ছ।
এই শিক্ষকসমাজের নেতৃত্বে ছিলেন এ দেশের কজন শ্রেষ্ঠ বুকিজীবী। অধ্যাপক হবিবুর
রহমান, প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর মহারুল ইসলাম, প্রফেসর ফজলুল
হালিম চৌধুরী, প্রফেসর জিলুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর মোশাররফ হাসেন—এমন সব
দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ তখন সেখানে। তাদের উদ্যোগে এবং উৎসাহে মার্চের প্রথম
সপ্তাহেই আসৃত হলো শিক্ষক সমিতির সভা। ডঃ সিরাজুল আরেফিন সভাপতি এবং
প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক। শিক্ষক সমিতির সভায় সাধারণতঃ
কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত হবার কথা নয়। আমিও সেখানে যাইনি। তবে দেশের চলতি
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সমাজের অনুসৃতব্য বিশেষ ভূমিকার বিষয়টি যেহেতু এই
সভায় নির্ধারিত হবে, সে কারণে কতকটা আবেগতাড়িত হয়ে উত্তেজনাবশতঃ ঝুঁঝোঁ
ভবনের বারান্দায় আমি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম। পূর্ব লাউঞ্জে শিক্ষক
সমিতির সভা চলছে। মাঝে মাঝে গরম গরম কথাও কানে আসছে। শিক্ষকেরা দারুণ
বিশ্বৰূপ। উচু পর্দায় তাদের কঠস্বর। হঠাৎ তখনই পূর্ব লাউঞ্জের জানালা দিয়ে দ্রুত লাফিয়ে
বেরিয়ে এলেন বেশ কজন শিক্ষক। বারান্দায় বেরিয়ে তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রায়
দোড়ে সোজা তাদের বাড়ীর পথ ধরলেন। তক্ষণে কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। কি
ব্যাপার ! কি হলো ! কজন শিক্ষক অমন তায়ে দ্রুতে সভা ত্যাগ করে পালালেন কেন ! সভা
শেষ হতেই সব শোনা গেল। তরুণ তেজী শিক্ষকদের কেউ কেউ ওই সভায় বাঞ্ছাদেশের
স্বাধীনতা ঘোষণার জোর দাবী তোলেন এবং এ রকম একটা সিজান্ট নেবার জন্য সভায়
উপস্থিত সদস্যদের উপর প্রচণ্ড চাপ্ট সৃষ্টি করেন। দেশদোহিতার ভয়েই হোক বা অন্য
কোনো কারণেই হোক, কজন শিক্ষক তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে সভা থেকে কেটে
পড়েন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঞ্ছাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি ওই সভা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবের উপর অর্পণ করে। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধু সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সভায় এমন
আশাও ব্যক্ত করা হয়।

শিক্ষক সমিতির এই সভার সিজান্ট কখনো লিখিত হয়নি। স্বাধীনতা ঘোষণার সপ্তক্ষে
সকলের একটা ঐক্যমত হবার পর মুখে মুখে সেটা বলাবলি হয় এবং দারুণ উত্তেজনার
মধ্যে সভাও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী যখন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের সেনানিবাস স্থাপন করলো, তখন স্বাধীনতা
ঘোষণা বিষয়ক এই সিজান্টের কথাটি তাদের কানে দ্রুত ঠিক ঠিক পৌছে গেল। আর তার
ফলে বিপন্ন হয়ে পড়লেন সভাপতি ডঃ সিরাজুল আরেফিন। তার উপর দখলদার
বাহিনীর প্রচণ্ড চাপ্ট শিক্ষক সমিতির সেই সিজান্ট কোথায়, বের করো। যে সিজান্ট লেখাই
হয়নি, তার মূল কপি কোথায় পাবেন তিনি ?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজেও তখন ক্রোধের আগুন। তেসরা মার্চ শহরে
সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও হত্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্রনেতার সময়োচিত
প্রদৃষ্ট ভূমিকা, পাকিস্তানের পতাকা দাহন ও বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা
উত্তোলন এবং স্বাধীনতার লড়াইয়ে ও অসহযোগ আন্দোলনে শেখ মুজিবের ডাক ইত্যাদি

ঘটনার ফলে ছাত্রদের প্রত্যেকটি রক্তকিদু তখন এক একটি অস্ত্র স্কুলিঙ্গ। দলমত নির্বিশেষে সারা দেশের প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ মানুষের সাথে আমাদের ছাত্রাও একাত্ম, স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বোধিত। কলাভবনের সামনে শহীদ মিনার চতুরে পোড়ানো হলো পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। তাহমিলুর রহমান কাজল, মীর শওকত আলী, শামসুল হক টুকু, জাহেদুল হক টুকু, ফজলুর রহমান পটল, শামসুর রহমান খোকন, নূরুল ইসলাম ঝাণু, আসাদুর রহমান বায়রন, হেইমু হামিদুর রহমান আরো অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মীর সক্রিয় ভূমিকায় এই দাহন কর্ম সাধিত হলো। স্বাধীনতা যুক্তে আয়ত্ত্ব সংগ্রামে ছাত্রসমাজ প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত-এই মর্মে এক শপথ পাঠের পর একদল ছাত্র ছুটে গেল শহর মুখে। চারদিকে তখন দারুণ উৎসোঝন। শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ। আমাদের উৎকঠারও শেষ নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তখন কেবল গণগোলের খবর। কোথাও বাঙালি-বিহারী দঙ্গা অথবা কোথাও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ। পথচাট বিপজ্জনক। যানবাহন অনিয়মিত। ভীত সন্ত্রস্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রী। তারই মধ্যে আবার কখনো কখনো কারফিউ লাগছে, ছাড়ছে। মধ্য মার্চের এক পর্যায়ে দলে দলে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হলত্যাগ শুরু হলো এবং পঁচিশে মার্চের আগেই শূন্য হয়ে গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রাবাস। তাই পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে সামরিক বাহিনীর পরিকল্পিত অপারেশন সেখানে আর ঘটলো না। ‘স্টুডেন্ট কিংহা স্টুডেন্ট কিংহা’ যুক্তে হন্তে হলো রক্তলোভী কতিপয় জওয়ান।

পঁচিশে মার্চের একদিন কি দুদিন আগে একটি হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল রাজশাহীর আকাশে। সবাই বললেন, বিশেষ রাতাবহ সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার। রাজশাহী সেনানিয়াসের কিছু কিছু গাড়ীর একটি ওদিক চলাচল কেউ কেউ লক্ষ করে একটু সন্দিহান হলেন : ব্যাপার কি ? কি হতে পারে ? এত মুভমেন্ট কেন ! চবিশ ফটা পর কি ঘটতে যাচ্ছে, তখনও আমরা সন্তুষ্ট অনুমান করতে পারছি না। ঢাকা থেকে পরম্পর বিবোধী খবর আসছে। ত্বরণ সর্বত্রই বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বৃত্ত আমাদের সংগ্রামী ছাত্র জনতা পূর্ণ সংজ্ঞাগ, সেটাই আমাদের গভীর বিশ্বাস। আমরা জানি শক্তির উৎস জনগণ। সুতরাং কার সাধ্য আমাদের এই মুটৈবেঁক হাতকে মোকাবেলা করে। বন্দুক ? সে তো নন্সি। বন্দুকের নল থেকে কটি গুলি বেরোবে ? কোটি কোটি মানুষের ঢলের মুখে কয়েক হাজার সৈন্য তো তেসে যাবে একটা কুটোর মতো। এমন সব প্রত্যয় বুকে ধারণ করে তখন আমরা নিশ্চিন্ত। সেনাবাহিনী কী জাতীয় জীব, তাদের শিক্ষা দীক্ষা কী অথবা যে পদার্থের অধিকারী হওয়ায় মানুষ প্রকৃতির অন্য প্রাণী থেকে পৃথক, সেই পদার্থটুকু তাদের আছে কি নেই, এসব কথা কখনো আমাদের মনে আসেনি। রাত পোহালেই চারদিকে আমাদের জয়জয়কার এমন সব খবরের প্রত্যাশায় তখন এক এক রাতে শয্যাগ্রহণ করতে থাকি।

ছাবিশে মার্চ ভোরে ধূম ভাঙতেই বারান্দায় আমার স্ত্রীর চেঁচামেচি কানে এলো। দোতলা ফ্লাট বাড়ীর বারান্দার রেলিং এর ওপাশে তাকাতেই দেখি, নিচে একজন জওয়ান রাইফেল উচিয়ে বিস্তিৎ শীর্ষের কালো পতাকা নামাতে হুকুম করছে আর আমার স্ত্রী তার সাথে মহাতর্ক শুরু করেছেন। সেই জওয়ান যত বলছে কালো পতাকা নামাও, আমার স্ত্রী ততই জ্বারে শোরে বলছেন ‘আমরা পতাকা নামাতে পারবো না।’ শেষে এক পর্যায়ে ব্যাপারটির মীমাংসায় আমি নামলাম। সেই জওয়ানকে বুঝিয়ে বললাম যে পতাকা যেখানে টাঙ্গানো, ওই চিলেকোঠার ছাদে আমরা উঠতে পারি না, আমাদের পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়,

অতএব প্রয়োজন থাই পতাকা নামাবার ব্যবহা করতে পারে। কালো পতাকা বিষয়ক ঝুঁটুমেলা মিটিয়ে ঘরে ফিরে ভাবছি, সাত সকালে বাসার সামনে হঠাৎ একজন জওয়ান কেন, কোথেকে এলো, কোন সাহসে ক্যাম্পাসে ঢুকলো, ঠিক এমন সময় শোনা গেল পর পর কয়েকটি গুলির শব্দ। জুবেরী ভবন মাঠের আশপাশ থেকেই এই আওয়াজ। উভয়ের জানালার বাইরে তাকাতেই চোখে পড়লো পাশের দালানের একতলায় সহকর্মী সৈয়দ ইবনে আহমদ সাহেব বারান্দার রেলিং-এ ঝুকে জুবেরী ভবন মাঠের দিকে উকি মারছেন। কি ব্যাপার কি ঘটেছে কিছু বুঝতে পারছি না। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। সৈয়দ ইবনে আহমদের কষ্ট।

‘বাইরে গুলি হচ্ছে, গুলি।’

‘কেন? গুলি কেন?’

‘আপনি কিছুই জানেন না?’

‘নাতো।’

‘রেডিও খুলুন। মার্শাল ল জারী হয়েছে। মার্শাল ল।’ ফটপট কথা শেষ করলেন সহকর্মী। কষ্ট তাঁর উপরেজন।

দারুণ উৎকষ্ট। রেডিও খুলতেই শোনা গেল ইয়াহিয়া খানের সদস্ত ঘোষণা : মুক্তিব দেশদ্রোহী। ক্রোধ এবং ঘণ্টা এক মুহূর্তে সারা দেহে ছড়িয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় এরচেঞ্জে যোগাযোগ করতেই অপারেটর জানালো, বাইরে কোনো লাইন যাচ্ছে না, ডাইরেক্ট লাইন সম্পর্ক সবই কেটে দেওয়া হয়েছে। অপারেটর আসো বললেন, প্রশাসন ভবনের দোতলায় ওঠার সিডির মুখে গার্ড আব্দুর রাজ্জাকের লাশ পড়ে আছে। আব্দুর রাজ্জাকের ছিল নাইট ডিউটি। পিচিশে মার্চ মধ্যরাতে প্রশাসন ভবনের সামনে সামরিক বাহিনীর গাড়িতে এসে দাঢ়িয়ে কঞ্জন জওয়ান। তাদের হক্কম স্মর্তৃ গার্ড আব্দুর রাজ্জাক লোহার কোলাপসিবল গেট খুলে দেয়নি বলেই তাঁর এই ঘোষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এত ভবন থাকতে প্রশাসন ভবনে তস্করের মতো এই হামলা কেন? কি উদ্দেশ্যে জওয়ানেরা গেট খুলতে চাইলো আর নিরীহ গার্ডকে হত্যা করে চলেই বা গেল বেম, এইসব ভাবনা মনে ভিড় জমালো। প্রশাসন ভবনের নিচের তলায় তখন হাবিব ব্যাংক রাজ্জাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যালয়। তবে কি সেই মধুর ভাণের থোঁজেই জওয়ানদের আগমন! এই সদেহ যে একেবারেই অমূলক ছিল না, তাঁর প্রমাণ পাওয়া গেল অনেক পরে। মধু এপ্রিলে হাবিব ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখাটি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর জওয়ানেরাই লুঠ করে।

ছবিলৈ মার্চ দুপুর পর্যন্ত গার্ড আব্দুর রাজ্জাকের লাশের কেন সংকার হয়নি। পরে লতিফ হলের প্রহরী মোঃ সদরউদ্দিন এই লাশ শ্যামপুর নিয়ে যান এবং সেখানেই রাজ্জাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ আব্দুর রাজ্জাককে তাঁর বাড়ীর পাশে কবর দেওয়া হয়। দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে বিধবা হলেন শহীদ স্ত্রী সোনাতান। নিদারুণ দৃশ্য ও কষ্টের মধ্যেও স্বামীর শেষ (মরণোত্তর) সন্তানের নাম রাখলেন ‘বিজয়ী’? সোনাতানের সেই বিজয়ের আসা আজো পূর্ণ হয়েছে কিনা কে জানে।

ছবিলৈ মার্চ থেকে যে সব হক্কম হ্যাকাম পাকিস্তান রেডিও থেকে শোনা গেল, তাতে দেশের পরিস্থিতি বুঝতে কারো বাকি নেই। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ছাত্রছাত্রীদের থোঁজে জওয়ানেরা ক্যাম্পাসে যত্নত্ব দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ভয়ে ঘর থেকে কেউ আর বের

হচ্ছে না। জুবেরী ভবনের দিকে খাকী পোশাকের চলাফেরা বেশী। ওখানে কয়েকজন তরুণ শিক্ষকও থাকেন। বি জানি ঠাঁদের খবর কি ! একেবারে নিকট প্রতিবেশী ছাড়া অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করতে হলেই একটু এগুতে হয় এদিক ওদিক। তা সম্ভব নয়। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিপদ ঘটতে পারে। ক্যাম্পাসের রাস্তায় রাস্তায় তখনও পাক সেনাদের দেখা যাচ্ছে। অতএব স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবারের অন্যান্য সবাই একত্রে চুপচাপ গৃহবন্দী হয়ে থাকাই তখন উচিত। তাই করলাম। কিছু সময় পার করা দরকার। তারপর কোন সময় কি করতে হবে তখনকার পরিস্থিতি বাতলে দেবে। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে আমরা ঘরে ষ্টেচাবন্দী। মাঝে মাঝে বেডিও পাকিস্তানের নানা ভাষ্যের দাপট শুনে সারা দেশের অসহায় অবস্থা অনুমান করতে চেষ্টা করছি। কি হচ্ছে চারদিকে তার সঠিক খবর পাবার কোনো উপায় নেই। ‘শেখ মুজিব দেশবেহী।’ ‘শেখ মুজিব বন্দী।’ এইসব বেতার প্রচারণার পর ঢাকা কি নিচুপ ? সাতই মার্চ ঢাকায় যে লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল, তারা কি সবাই মীরব ? বিশ্বেত প্রতিবাদ কি এত সহজে স্থৰ্য করা যায় ? এই সব ভাবনায় মন আচ্ছাপ। ওইদিনই সঙ্ক্ষেবেলা আকাশবণী কলকাতায় একটি ছোট মেয়ে ভাঙা গলায় কাঁদতে গাইলো – আ-মা-র সে-না-র বা-ঙ-লা আ-মি তো-মা-য় ভা-লো-বা-সি। গান নয়, কান্না, অতল উপলব্ধির মর্ম থেকে উৎসারিত অব্যক্ত বেদন। আমাদের কারো মুখে কথা নেই। দম প্রায় বৰ্জ। অনেক দূরের একটি ছোট গুলীর শব্দও আমাদের কানে ধরা পড়ছে – ‘ওই ওই গুলির আওয়াজ !’ আমরা এক একবার এক একজন যেন আর্তকষ্টে বলি। হ্যা, সেই রাত ঘেকের পুরু হলো আমাদের বিনিজ রাতের পালা।

সাতাশে মার্চ সকালে ভাইস চাম্পেল ভ্রমণের অফিস কক্ষে আমরা কংজন কর্মকর্তা উপস্থিত হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম আবার স্বাভাবিকভাবে যথারীতি চালিয়ে নেবার জন্যই আমাদের জ্ঞানীর তলব। দেশের সঠিক পরিস্থিতি কী, কেউ একবারও সেই আলোচনায় যাচ্ছেন না। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় কি হয়েছে না হয়েছে, তার কিছু কিছু খবর লোকের মুখে মুখে অথবা আকাশবণীর মাধ্যমে তখন আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেই মর্মান্তিক খবর সারা দেশে আগন্তুনের মতো ছড়িয়ে গেছে। ভাইস চাম্পেল সমীপে উপস্থিত হয়ে আমরা পরম্পর ঠোট নাড়ছি, কিন্তু কারো মুখেই তেমন কোন কথা নেই। আমাদের সকলের চোখই খোলা, পরম্পরের দিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিরীহ শাস্ত গোবেচারা সাতেপাঁচে না থাকা ছাপোমা চির অনুগত বশংবদ জীব আমরা তখন শুধু হৃকুমের প্রতীক্ষাত্বু। কর্তৃপক্ষের ভাবধানা এই রকম যেন গুটিকয়েক দুষ্টলোক গোলমাল করছিল, সরকার তাদের দমন করে ফেলেছে, এখন সব ঠিক ঠাক চলবে, কোনো ভাবনা নেই। এমন কি পঁচিশে মার্চ রাতে প্রশাসন ভবনে ডিউটিরিত গার্ড আবুর রাজ্জাক কেন নিহত হলো, তার লাশ কখন কিভাবে দাফন করা হলো কেউ সেকথাও বলছি না। অথবা জুবেরী ভবনে যে তিনজন শিক্ষক ছিলেন ঠাঁদের সাথে পাকসেনারা কেমন আচরণ করেছে, তা একটু একটু জানলেও আমরা কেউ উচ্চারণ করছি না। ফলিত রসায়ন বিভাগের শহিদুল ইসলাম ও গণিত বিভাগের মুজিবুর রহমান কেমন করে রঞ্জ পেলেন, অর্থনীতি বিভাগের অঙ্গিত কুমার ঘোষ কেনই বা ওয়াজেদ গাউস নাম ধারণ করল এসব

কোনো কিছুই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। আমরা তখন অসার কথাবার্তা চলাচ্ছি। আমাদের ভাবধানা সব ঠিক হ্যায়, সব ঠিক হ্যায়। এমন এক অবস্থায় হট করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো রেজিস্ট্রার আদুর রহিম জোয়ার্দারের পুত্র বাবু। তার বাবাকে একটি দুঃসংবাদ দেবার জন্যই সে এমন করে ভাইস চাম্পেলরের খাস কামরায় ঢুকে পড়েছে। জোয়ার্দার সাহেবের নিকট আভীয় রাজশাহীর বিলিট আয়কর আইনজীবী আবদুস সালাম সাহেবের দুই পুত্র শহিদজুমান ও ওয়াসিমুজ্জামানকে পাকিস্তানের জওয়ানেরা ধরে নিয়ে গেছে এবং হয়ত তারা দুজনেই নিহত এই ছিল বাবুর দুঃসংবাদ। এমন দারুণ দুঃসংবাদে হঠাতে যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন রেজিস্ট্রার জোয়ার্দার। পুত্রের দিকে তাকালেন। ফ্যাকাশে তার মুখ। দুঃসংবাদের ধাক্কা একটু সামলে নিয়ে পুত্রকে তিনি বললেন : ‘আমি বাড়ি আসছি।’ সব ঠিক হ্যায়, সব ঠিক হ্যায় আমাদের সেই ভাবধানা, সেই মুখোশ হাজার চেষ্টা করেও আর ধরে রাখা গেল না। কিছুক্ষণ অসার আলোচনা চালিয়ে আমরা যে যার বাসায় ফিরে এলাম।

মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন বারবার ঘূরপাক খেতে লাগলো : রাজশাহী শহরে কি ঘটেছে কিভাবে জানা যায়। সাতাশে মার্চ বিকেল থেকে ক্যাম্পাসে জওয়ানদের আনাগোনা তেমন দেখা গেল না। চারদিক বড় থমথমে। কারো কাছেই কিছু স্পষ্ট জানা যাচ্ছে না। উড়ু উড়ু কত খবরের হচ্ছাইতি তখন। কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা কোনটি গুজব কে জানে। আসলে ওই সময়ে রাজশাহী সেনানিবাসে সৈন্যসন্তার পর্যাপ্ত ছিল না। তাছাড়া কুষ্টিয়া ও পাবনায়ও এক কঠিন প্রতিরোধের মোকাবেলা করে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী। আঠারো জনের একটি দল আবার মেজর আসলামের নেতৃত্বে গুর্যের পথ ধরে ওই সময়ে পাবনা থেকে রাজশাহী আসার চেষ্টা করে। লালপুর গোপ্যলপুর কিংবা কাছাকাছি কোনো স্থানে এই দলটির উপরও বিপর্যয় নামে। মুখ্যমূল্য সংযোগে মেজর আসলামসহ অনেকেই প্রাণ হারান। পরবর্তীকালে এই মেজর আসলামের হত্যার প্রতিশোধে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী ওই এলাকার আশে পাশের হাজার মানুষকে বৃশৎসভাবে হত্যা করে।

সাতাশে মার্চ রাত থেকেই দূরে গুলিগোলার আওয়াজ একটু বেশি বেশি শোনা গেল। তার পরদিন তো প্রায় দিনভর শহরের প্রান্ত থেকে ভেসে এলো ভারী ও মাঝারি গুলিগোলার অবিরাম শব্দ। পরদিন কি তারও পরদিন সবাই জানলাম পুলিশের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে গেছে। ভেড়ি পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেকে এই গুলি বিনিময়ের প্রত্যক্ষদর্শী। একদিকে পুলিশ ও জনতা এবং অন্যদিকে পাকসেনার দল।

আটাশে মার্চের পর ক্যাম্পাস মোটামুটি শাস্তি। থান সেনাদের উৎপাত আনাগোনা একেবারেই নেই। রাতের বেলায় হানিও উন্তুর পক্ষিয় দিকে বহুদূরে গুলিগোলার শব্দ ঘটার পর ফটা শোনা হ্যায়, দিনের ফাঁকটুক মোটামুটি নিরপেক্ষ। আমরাও এখানে ওখানে জটলা পাকাই, পরস্পর থবর লেনদেন করি, কি করা উচিত না উচিত সে বিষয়ে একে অপরের পরামর্শ নিই। আবার কেউ কেউ ওই সময়ে চুপচাপ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তারা কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানি না। কেউ কাউকে পুরো কথাটি বলছেন না, কেউ বলতে পারছেন না তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। কেউ কারো উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কেউ কারো ভরসায় চূপ করে থাকতেও পারছেন না। এক একশ বছর পর

যেন একটি রাত কাটে, একটি সকাল পাই। আর তঙ্গুণি শুনি অমুক গতরাতে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে গেছেন। এমনকি আমার দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এভাবে একদিন নীরবে চলে গেলেন। মনে মনে একা একা একটি অসহায় মানুষ হয়ে গেলাম যেন। বন্ধুরাও চলে গেলেন, কিছু না বলেই গেলেন। তাহলে কি ক্যাম্পাসে অবস্থান নিরাপদ নয়। রাত্তর জানালায় বসে উত্তর-পশ্চিম দিকে বহুদূরে গোলাঞ্চলির আওয়াজ শুনি আর নানা দুর্ভবনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করি, ‘আর নয়, চলো এবার আমরাও বেরিয়ে পড়ি, সবাই যাচ্ছে।’ আমার স্ত্রীর একই কথা ‘কোথায় যাবো? সারা দেশে নিচ্ছাই এই একই অবস্থা। তাছাড়া পুত্র প্লেটো কিছুদিন আগে মাসখানেক ডিপফিরিয়ায় ভোগার পরপরই প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়। তার চিকিৎসা তখনও চলছে। তাই একটি অসুস্থ স্থান নিয়ে কোথায় পথে পথে ঠোকর খেতে হয়, এমন দৃষ্টিস্থাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর যাবেই বা কোথায়। রাজশাহী অঞ্চলে আমরা তখন নতুন। আশেপাশের কিছুই চেনা নেই। খুনার স্ফুরণ ফেরার ইচ্ছা থাকলেও তা কখনোই সম্ভব নয়।

আমাদের উত্তরে পিছনের দালানের তিনতলায় থাকতেন শরীর চর্চা বিভাগ প্রধান আনসার আলী। ওই সময়ে তিনি একদিন জানালেন স্বাধীন বাঙ্গালার ঘোষণা কোনো এক বেতার কেন্দ্র থেকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কাছাকাছি রেডিও টিউনিং করলেই এই কেন্দ্রটি ধরা যাবে। অনেক চেষ্টার পর সেই বেতার কেন্দ্রটি অবশ্য ধরা গেল শেষ বিকেল নাগাদ। বঙ্গবন্ধুর নামে সেখানে বাঙ্গালাদেশের স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হলো, মাঝে মাঝে বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি এটা^১ প্রেরণা নির্দেশজ্ঞারি, তাছাড়া মানুষের মনোবলকে সমুত্তৰ রাখার উদ্দেশ্যেই সর্বত্র স্বাধীনতার সৈনিকদের রখে দাঁড়াবার ভালো ভালো খবর। কোনো এক পর্যায়ে ওই বেতার সম্প্রচারে ঘরকে নিষ্পত্তীপ করার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ মতো আমরা সেই স্থানে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিষ্পত্তীপ করার প্রয়োজন কোথায়, তা ঠিক বোঝা গেল না। তাতে কি। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক; সমগ্র দেশবাসীর জন্য যখন এই নির্দেশ, তা মানতেই হবে। নিচ্ছাই কোনো কারণ আছে। যে আশার প্রদীপ একেবারে নিভু নিভু হয়েছিলো, ঘর নিষ্পত্তীপ করতেই যেন সেই প্রদীপের স্লত্তে একটু উস্কে উঠলো। তাহলে আমরা কখন দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমরা পারবো কি? মনে সাহস আনার চেষ্টা করি, কিন্তু একটা অজ্ঞান ভয় কিছুতেই কাটেনা, মনে জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। আমার স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ সাহসী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বহবার তিনি সেই সাহসের প্রমাণ দিয়েছেন। স্বাধীন বাঙ্গালার বেতার কেন্দ্রের প্রচারণা তাকে আরো উন্নীশ্ব করে তুললো। যুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত এবং নিকটবর্তী এই বিশ্বাসে তিনি ক্যাম্পাস ত্যাগের পক্ষে কোনো যুক্তি পেলেন না।

এক বিকেলে ভাইস চাস্পেলর ডঃ হোসায়েন সমীপে উপস্থিত হলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের তিনি অভিভাবক। হয়ত আমাদের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি কিছু ভাবছেন। আমরা কি করব কিছুই যে স্থির করতে পারছি না। ভাইস চাস্পেলর ভবনের লাউঞ্জে প্রফেসর মোশাররফ হোসেনকেও পেলাম। দু এক কথার পর আমার মনের ভয়াত্ত ভাবটি ধরে ফেলে এক গাল হেসে আমাকে একটু চাঞ্চ করতে চেষ্টা করলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন : ‘তত ঘবড়াও ক্যান? আমরা আছি তো সবাই।’ তখন অনেকেই

হয়ত তাই ভেবেছিলেন। ঘর ছাড়বো কেন? যাবো কোথায়? প্রফেসর মোশাররফ হেসেন ছিলেন আমাদের পরম শুভনন্দ্যায়ী। তাঁর বাসায় আমরা দু একবার বস্তুরা মিলিত হয়েছি। তখন সামরিক বাহিনীর একটি ছোটো বিমান রাজশাহীর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতি সঙ্গেও ক্যাম্পাস ত্যাগের পরামর্শ তিনি দেন নি এবং তাঁর নিজেরও সে পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাস আরকড়ে পড়ে থাকার সিদ্ধান্তে অটল থাকা কারো পক্ষেই সন্তুষ্ট হলো না। দোসরা এপ্রিল শহরের বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি এ্যাডভোকেট বীরেন সরকার ও সুবেশ পাণ্ডেকে নির্মম ভাবে হত্যা করলো দখলদার পাক সেনারা। এই মর্মান্তিক ঘটনা জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজশাহীর সকল শ্রেণীর মানুষের চোখ নতুন করে খুলে দিলো। সবাই বুঝলো এ দেশের মাটিতে আর এক মুহূর্ত নয়, এখানে অবস্থান মানেই নির্বাণ মতু, পাকসেনারা নির্বিচারে গণহত্যায় নেমেছে। ব্যাস, লক্ষ লক্ষ মানুষ দুদিনের মধ্যে পৰ্যা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। এমন কি আমার বস্তুরাও সবাই হঠাতে চলে গেলেন। আমি কিছুই জানতে পারলাম না। এখনো তাই বলা হয়, শহীদ বীরেন সরকার ও শহীদ সুবেশ পাণ্ডে এক অর্ধে গেটো রাজশাহীর মানুষকে বাঁচিয়ে গেছেন। তবুও যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার চেষ্টা করলো, তারাও মধ্য এপ্রিলের সামরিক অভিযানের মুখে আর দাঁড়াতে পারলো না।

এপ্রিলের সূচনায় রাজশাহীর আকাশে একটি প্লেনের বারবার আনাগোনা ভয়ের কারণ হয়ে পড়লো। মধ্য দুপুরে প্লেনটি আসে আর এদিক ওদিক গুলিবর্ষণ করে চলে যায়। প্লেনটি কেন আসে, কেন যায়, কেন গুলিবর্ষণ করে কোথায় তার লক্ষ্যবস্তু আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। একদিন দুপুরে মনে হলেন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাছিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাথার উপরই প্লেনটি চক্র ঝাঁকে এবং গুলিবর্ষণ করছে। আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য একত্রার ফুটাটে অস্ত্রজ্ঞ নিলাম। শুধুমাত্র আমার স্ত্রী নিষেধ সঙ্গেও তেলার ছাদে উঠে গেলেন। কোথায় গুলিবর্ষণ হচ্ছে তাঁর দেখে চাই।

প্রতিদিন একটি প্লেনের আকাশময় ডিগবাঙ্গি ও উৎপাতে আমার স্নায়ু শিথিল। আমার মন বলছে ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে পরিবারের একটি মানুষের সিদ্ধান্তই চড়ান্ত হতে পারে না। অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে গ্রামে গঙ্গে হয়েনানির বিহয়টি ছাড়াও আমার স্ত্রী তখন তাঁর এক অনুজ্ঞার ভালোমদন সম্পর্কে ভাবিত; আমার শ্যালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর গায়ের রঙটি চোখে পড়ার মতো। অতএব এমন একজন তরুণীকে নিয়ে পথেঘাটে চলাফেরা কঠিন, কখন কি ঘটে।

আমাদের ঠিক নিচের তলার ফুটাটে ছিলেন সহকারী গ্রন্থাগারিক মুহূর্মদ তাহা। আরবী ভাষায় তাঁর উচ্চতর পড়াশোনা। পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি একজন পৌর অথবা মওলানা। কিন্তু এমন একজন উদার কুসংস্কারমুক্ত সংজ্ঞা ব্যক্তি সমাজে কমই মেলে। তাঁর প্রতি আমার প্রগতি শ্রদ্ধা। তাহা ভাই বললেন, আর নয়, এবার তিনিও চলে যাবেন তাঁর গ্রামে। আমাকেও ডাকলেন— ‘চলুন কোন ভয় নেই, আমাদের কাছে থাকবেন।’ আমার স্ত্রী তখনও অটল। তেসরা এপ্রিল তাহা ভাই ও তাঁর ভাইপো পরীক্ষা নিঃস্তুক দণ্ডের আন্দুল মানুন সাহেবে পরিবারের সবাইকে গুছিয়ে একসাথে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেলেন। ওরা যাবার সময় আমাকে ওদের গ্রামের ঠিকানা দিয়ে গেলেন : ‘কেশবপুর, বাঘা।’ কিভাবে কোন পথে ওখানে যেতে হবে, তাও বলে গেলেন ওরা। বিপদে মেন অবশ্যই ওদের সুরণ

করি, ওদের গ্রামে যাই, বার বার ছিল সেই অনুরোধ। আমার মনে হতে লাগলো, দুর্দিনে এমন বস্তুর হাত ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। কি করি। এগুলোর চার ও পাঁচ তারিখ দুদিনেই রিকশা ডেকে আনি, কিন্তু বাড়ীর সবাই ক্যাম্পাস ত্যাগের বিষয় একমত হতে না পারায় শেষ মুহূর্তে রিকশা বিদায় দিই, যাওয়া হয় না। এদিকে পয়সাকড়িও তেমন আমার নেই। একেই সঞ্চয়ী নই, তার উপর দেশের এই দুর্ঘটণে এমন আকস্মিকভাবে ঘায়েল হয়েছি যে একেবারে অপস্তুত।

ছয়ই এগুল সকালে উঠে খবর সংগ্রহের চেষ্টায় এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছি। কে যেন বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপরেই নাকি পাক সেনাদের সবচেয়ে বেশী আক্রেশ, আর সেই কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত জন শিক্ষককে এক রাতে হত্যা করেছে। আরো শোনা গেল, পথেচাটে ইউনিভার্সিটির কাউকে পেলেই খানসেনারা তাকে বেশড়ক মারধোর করছে এবং ইতিমধ্যে রাজশাহী শহরে আমাদেরই একজন অধ্যাপক ওদের প্রশ়্নের উত্তরে তাঁর পরিচয় ‘প্রফেসর’ বলায় তাঁর পক্ষাংশে একটি লাথি পেয়েছে। এসব কথা শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার শ্রীও বুঝলেন ক্যাম্পাসে বাস মানেই বিরাট ঝুঁকি। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের প্রতি সামান্য সম্মানবোধ যদি পাকসেনাদের থাকতো, তাহলে কি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন নৃৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে !

ওই দিনই ছয়ই এগুল দুখানা রিকশায় চেপে আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা মানে শ্রী, শ্যালিকা, পুত্রকন্যা ও বছর বারো বয়সের একটি কাজের ছেলে। নাম শাহ আলম। প্রায় এক বশ্রে পথে নেমেছি। লটবহর বাড়িয়ে লাভ কি। কোথায় থাকবো, কেমন থাকবো কিছুই তো জানি না। আমার সংস্কৰণ এমন কিছু মহামূল্যবান বস্তু সামগ্রী কোনদিনই ছিল না। তবুও সখের যা কিছু কৃত্বন ছিল, সবই ফেলে শুধুমাত্র একটি ছেট ট্রান্সিস্টর রেডিও নিয়ে পথে বেরোলাম, আক্ষরিক অব্দেই একেবারে অজ্ঞানার পথে।

পথে নেমেই মনে হলো প্রতিবেশী ভাব ভাইয়ের কথা। তিনি বারবার বলে গেছেন— যদি বাইরে যেতেই হয়, তাঁর গ্রামেই যেন যাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামে বসবাসের অভিজ্ঞতা আমাদের কারেই নেই। ছেলেবেলায় দু একবার গ্রামে গেলেও সে যাওয়া ছিল শিকনিকের মতো বটিকা সফর। গ্রাম সম্পর্কে সেই আনন্দময় স্মৃতিটুকুই আছে। সেখানে বসবাসের কত রকম অসুবিধা হতে পারে, তার কোনো বাস্তব ধারণা আমাদের নেই। তবুও সেই গ্রামেই একটু আশ্রয় খুঁজতে হবে, যদি পাই।

বিনোদপুর ছাড়িয়ে রিকশা ছুটলো সরদহের পথে। কাটাখালির ঘোড় পার হবার সময় দেখি এক ভদ্রলোক, চেনা চেনা মনে হয়, এক দোকানে বসে। আমাকে দেখেই তিনি যেন চমকে উঠলেন। আমাদের রিকশা খুব স্পীডে সেই মোড় পার হয়ে গেল। কিন্তু কিছুর এগোবার পর মনে হলো, কে যেন পিছনে আসছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি কাটাখালির সেই চেনা চেনা ভদ্রলোক, সাইকেলে। দ্রুত প্যাডেল করে তিনি আমার পাশে এলেন, তারপর আমাকে ভালো করে দেখে কি যেন অস্পত উচারণ করে খেয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হলো, ব্যাপার কি ! রিকশা খামিয়ে ভদ্রলোককে ডাকলাম : ‘কি হয়েছে, আমার পিচু নিলেন কেন?’ ভদ্রলোক খুবই নিরীহ সবিনয়ে জানালেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, নাম মোফাজ্জল হোসেন। কাটাখালির এক দোকানে তিনি বসেছিলেন। আমাকে দেখে পাশের কে যেন তাঁকে বলেছে ‘ওই যে উচ্চর ময়হুরল ইসলাম চলে যাচ্ছেন’ তাই

তিনি সাইকেলে ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন, কেননা ডঃ ইসলাম তাঁর পরিচিত। এ কথা শুনে কিন্তু আমি আশুস্ত হলাম না। বরং অন্য এক ভয় আমার মনে ঢুকে পড়লো। ডেক্টর যবহারুল ইসলামের সাথে আমার চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে সহপাঠিনী দিলারা হাশেম কিংবা বেতার বন্ধু গোলাম রাকবানী খান অতীতে মাঝে মাঝে বলেছেন। তাঁদের কথা আমি ঠিক্কাই ভেবেছি এতকাল। কিন্তু সত্যিই যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহলে একটু দুষ্পিত্তার কারণ বৈকি। শোনা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপক মনিকুম্ভামানকে মারতে গিয়ে আর এক অধ্যাপক মনিকুম্ভামানকে শুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নামের মিলের চেয়ে চেহারার সাদৃশ্য তো আরও মারাত্মক। ডঃ ইসলাম নিশ্চয়ই পাক সেনাদের তালিকায় পহেলা নম্বরের দেশবোষী। তিনিও তা জানেন। সুতরাং তাঁকে খুঁজে পাওয়া হয়তো সহজ নয়। কিন্তু আমি যে প্রকাশ্য, ওদের হাতের নাগালে। শেষে কি একটা ট্রাঙ্গেডী অব এরের হয়ে যাবে!

বানেশ্বর মোড় থেকে সরদহ মুখী ডানদিকের পথে নেমেই সব ভয় হেন এক মুহূর্তে বাষ্প। একটি ঝীপ আসছে, খোলা ঝীপ। কয়েকজন মানুষ তার উপর দাঁড়িয়ে, বসে। তাদের মাথায় তারকা চিহ্নিত ক্যাপ, হাতে রাইফেল। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা রাইফেল উচিয়ে বললো— ‘কোনো ভয় নেই, এসব এলাকা আমাদের দখলে।’ এইটুকু আশ্বাসে আমাদের সে কি আনন্দ। আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। সুতরাং আর ভয় কি? মনে হলো, দু চারটে রাইফেল থাকলেই ওই পুরুষ সেনাদের ঠেকানো যাবে। কজন আসবে ওরা। এদেশে আছেই বা কজন।

পথ চলতে চলতে এবারে আশেপাশে একটু চেষ্ট পড়লো। বাহ গাছপালা কি সবুজ। কি দারুণ ঝাকঝাকে। বাতাসও এমন মিটি, যোদের তাপই নেই। চারপাশটা পাখির ডাকে ভরে আছে, এতক্ষণ তা খেয়াল হয়নি। আসন্নেই আমাদের মনের সহযোগিতা ছাড়া কান কিছুই শুনতে পায় না। এতদিনের অবসান ক্ষেত্রে দুর্ভাবনা মনে হলো দূর হয়ে যাচ্ছে। একবার কোনো গ্রামে আশ্রয় পেলেই, ব্যস্ত মিষ্টিত্ব।

মনের আনন্দ যখন আবার এমন করে ফিরে ফিরে আসছে, তখনই আবার এক বিপত্তি। মাথার উপরে একটি প্লেন কোথেকে হঠাত এসেই এদিক ওদিক ছোট্টাছুটি ডিগবাজি ও নানা কসরৎ করতে করতে আশেপাশে শুলিবর্ষণ শুরু করলো। এক একবার প্লেনটি যখন আমাদের ঠিক মাথার উপরে আসে, আমরা ভাবি আর রক্ষা নেই, এবারই মরতে হবে, অস্তিম সময় উপস্থিতি। এই নির্জন রাস্তায় শুলিবিন্দু হয়ে আমরা কুকুরের মতো মতু বরণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু না, প্লেনটির লক্ষ্যবস্তু আমরা নই, অন্য কোথাও তার টাগেট। একবার মনে হলো, কোনো গাছের নিচে এ সময়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্তু রিকশাঅলারা রাজ্ঞী নয়। আমাদের সরদহ পৌছে দিয়ে তাদের আবার রাজশাহী ফিরতে হবে। অতএব নিরপায় হয়েই আমরা পথ চললাম। কিছুক্ষণ পর প্লেনের শুলিবর্ষণ আর শোনা গেল না।

সরদহ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীর মোড়ে রিকশা থামলো। এবারে টমটমে উঠেবো আমরা। গন্তব্য একটি স্থির করেছি, তাহা ভাইয়ের গ্রাম, কেশবপুর। টমটমে ওঠার আগে বেশ কজন তরুণ ঘূরক আমাদের ঘিরে ফেললো। আমার শ্যালিকার পোশাক আশাক একটু পাকিস্তানী মাকি দেবেই হয়তো ওদের মনে এত প্রশংসন। আমরা বিহারী না বাঙালি, তা

ভালোভাবে ঘাচাই করে ওরা রেহাই দিল আমাদের।

চারঘাট পার হতেই দেখি একজন মানুষ বন্দুক হাতে গাছতলায় বসে। তারও নানা জিজ্ঞাসা নানা জ্বে। এসব ব্যাপারে একটুও বিরক্ত হইনি। বরং এ কথা ভেবে বেশ ভালোই লাগছিল যে আমাদের স্বাধীনতার সৈনিকরা খুব সতর্কতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। যে ভয় এবং আতঙ্ক আমাদের ঘর ছাড়ালো, তা ঠিক তেমন আর নেই, কমে গেছে। গ্রামের পথ দিয়ে টমটম যত এগোয়, আমরাও যেন তত নিরাপদ বোধ করি।

দুপুর বারোটা নাগাদ ফীরগঞ্জে বাজারে পৌছে গেলাম আমরা। টমটম থামলো। ঘোড়া পানি থাবে। একটু বিশ্রাম চাই তার। তখন সেই বাজারে আমাদের বীর যোকাদের জন্য কুঠি তৈরীর ধূম পড়ে গেছে। আমাদের দেখে জন তিনেক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন :

‘আপনারা কোথাকে আসছেন?’

‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।’

‘কোথায় যাবেন?’

‘কেশবপুর।’

‘সেখানে বাড়ী?’

‘না। তবে এক সহকর্মীর বাড়ী। বিপদে পড়লে সেখানে যেতে বলেছেন। পথ ঘাট যদিও ঠিক চিনি না।’

‘কোনোদিন গ্রামে বাস করেছেন?’

‘না।’

‘তাই মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে কারা?’

সকলের পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোকেরা একটু আড়ালে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর আবার আমার কাছে এগিয়ে এলেন :

‘যদি চান আপনারা এখানে থাকতে পারেন।’

‘কোথায়?’

‘এখানেই। এই পাশেই আমাদের সেরিকালচার ফার্ম। সেখানে এক কামরার কয়েকটি পিঅন কোআর্টার খালি আছে। ওই দেখুন।’

এক নজর দেখেই আমার পছন্দ হলো স্থানটি। এক উদ্যান ছেড়ে এসেছি। এ যেন আর এক মনোরম বাগান। বেশ ছিমছাম। তাছাড়া ঝড় বাদলার দিন আসছে। পাকা দালানে বাস করায় কত সুবিধা। যখন আমি এসব ভাবছি, আমার স্ত্রী তখন সুন্দরী অনুজ্ঞাকে নিয়ে দৃশ্টিস্তাগ্রস্ত। ভদ্রলোকদের অতি আগ্রহ তাঁর সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এক মুহূর্তে আমার মনস্ত্রি। আমার মনে হলো, চরম দুর্দিনে পরম বক্রুর সাহায্য পাচ্ছি। অতএব কেশবপুর যাওয়া হলো না। ফীরগঞ্জের সেরিকালচার ফার্মে আমরা আশ্রয় পেলাম।

যখন শহর ছেড়ে পালিয়ে গ্রামের একচালা ঘরের বারান্দায় ঝড়বষ্টির মধ্যে মানুষ দিন কাটাচ্ছে, তখন আমরা একটি পাকা বাসগৃহে। সেই ছেট কোআর্টারের ভিতরে একটি টিউবওয়েল ও একটি স্যানিটারি টয়লেট। সেখানে আমরা ওঠা যাওয়া ফার্মের ম্যানেজার মতলেবুর রহমান একটি ক্যাম্প খাটোর ব্যবস্থা করে দিলেন, দরজা জানালার যেখানে ঘেটুকু অসুবিধা ছিল, তার সম্মতির করিয়ে দিলেন, ঝাড়ুদার দিয়ে ঘরবাড়ী পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন করিয়ে দিলেন। শুধু কি তাই, ওই দিন দুপুরে ঠিক যথাসময়ে এক বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা হলো! সেদিন আমার মতো ভাগ্যবান আর কে ছিল! কার পুণ্যফলে যে সেই দুর্দিনে অমন আশ্চর্য সুন্দর মানুষদের কাছে পেয়েছিলাম!

সৌভাগ্য কেবল আমাদেরই শুধু নয়। রাজশাহী ছেড়ে পালিয়ে আসা আরো কয়েকটি পরিবারও সেরিকালচার ফার্মে স্থান পেলেন। বিপদ্ধন্ত কাউকে দেখলেই ফার্ম কোআর্টার্সগুলিকে তার ঠাই করে দিতেন ফার্মের কর্মকর্তাগণ। ফার্মের ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এমন কেউ কি এখনও আছেন যাঁর উচিত এক্সাম ক্যাম্পাস ত্যাগ করে কোথাও যাওয়া, অথচ তিনি যেতে পারছেন না কোথাও। সেই মুহূর্তেই আমার মনে এলো একটি নাম : গণিত বিভাগের অধ্যাপক হবিবুর রহমান। অধ্যাপক রহমানের বাড়ী নোয়াখালি এবং তাঁর পরিবারও বেশ বড়। তাঁর পক্ষে চট করে কোথাও যাওয়া মুশ্কিল। ফার্মের ম্যানেজারকে বললাম সে কথা। আরো বললাম, অধ্যাপক হবিবুর রহমান একজন বাঙালি জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতার সপক্ষে নেতৃত্বানীয় মানুষ। সে কথা শুনে ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছু করতেই হবে। মীরগঞ্জেরই ছেলে বাচু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্র, এ বাপারে সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এলো। সে ঠিক করলো সে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে অধ্যাপক রহমানকে বলবে যে তাঁর পরিবারবর্গের জন্য মীরগঞ্জে ভালো বাসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, অতএব তিনি যেন আরুদ্দেরী না করেন। অধ্যাপক হবিবুর রহমানের কাছে আমাদের উৎকষ্ট জানিয়ে বাচু স্বত্বার তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো—স্যার, চলুন সবাই আমার সাথে। কিন্তু নিষ্কল সেই প্রচেষ্টা। অধ্যাপক হবিবুর রহমান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ক্যাটেন কখনো যুক্তিশৈলী ছেড়ে যায় না, তাহলে অন্যান্য সবাই থাকবে কি করে?’ আশ্চর্য সাহসী স্পষ্টবাদী এবং আর্দশ্রে অটল মানুষ এই অধ্যাপক হবিবুর রহমান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তেক্ষণেই এগিল ক্যাম্পাস দখল করেই পরদিন অধ্যাপক রহমানকে ডেকে নেয় স্বুবোরী ভবনে সামরিক দফতরে এবং শুনেছি সেখানে কর্মেল তাজ নাকি পাঁচ মিনিটের জেরায় আবিষ্কার করেন মানুষটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার একজন বড় সৈনিক, বড়ই খতরনক আদমী। অধ্যাপক হবিবুর রহমান সত্যবাদী ও নিরাপোষী বলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

মীরগঞ্জে দিন চারেক খুব ভালোই কাটলো। আমার হাতে পয়সা তেমন ছিল না, কিন্তু তাতেও অসুবিধা হয়নি। ফার্মের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বাচু তাঁদের বাড়ী থেকে দুধ ডিম ইত্যাদি পাঠাতে শুরু করলেন। গ্রামের মানুষের এই প্রাণের স্পর্শে আমি কৃষ্টিত। কিন্তু তাঁরা কি সে কথা শোনেন। আমার পুত্র অসুস্থ, অতএব এসব নিতেই হবে। আমিও কিছুটা নিরপায়। হাত পেতে নিতেও হচ্ছে, নইলে ভাঙ্গার নিদেশিত ন্যূনতম খাদ্যাও অসুস্থ পুত্রকে দেওয়া হয় না।

মীরগঞ্জে বিকেল ও সক্যায় কয়েকটি পরিবার একত্র হয়ে ঢাকা ও কলকাতা বেতার কেন্দ্র শোনা এবং জল্পনা কল্পনাই ছিল আমাদের কাজ। কখনো কখনো দিনের বেলা মীরগঞ্জের বাজারেও অনেকে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসতাম। সেখানে ভারতীয় বি. এস. এফ. এর দু একজন ব্যক্তিও নদী পার হয়ে এসে এই আলোচনায় শামিল হতেন। এক একবার মনে হতো ওদের সাথে ওপারে চলে চাই। চারদিকে খবর যা

পাঞ্চিঁ, কদিন এভাবে চলা যাবে। আমার শ্তীর বাড়ী বীরভূম। সেখানে তাঁদের অনেকে আছে। পাঞ্চিম বাঙ্গলায় আমারও বহুবাস্তব কম নেই। তবুও দেশ ছাড়ার ব্যাপারে কিছুতেই মনস্থির হলো না।

অর্থ বাঙ্গলাদেশের ভয়াবহ খবর তখন চারদিক থেকে লোক মুখে মুখে ভেসে আসছে। পাকিস্তান রেডিও থেকে যা পাওয়া যায়, তা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সেখানে লোকের কথার সত্যতা মেলে। পাকিস্তান রেডিও বলছে, বিভিন্ন স্থানে দেশপ্রেমিক সেনাদলের এক একটি বহর যাচ্ছে আর দুর্কৃতকারীদের দমন করে সেখানে তারা শাস্তি প্রতিষ্ঠা করছে। দশই এপ্রিলের পর রাজশাহী ছেড়ে আরো মানুষ পালাতে লাগলো। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর একটি বিরাট দল উত্তরাঞ্চল অভিযানে তখন যুনু পাড়ি দিছে বলে জানা গেছে। বারোই এপ্রিল সকালে খবর এলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ওয়ালিউজ্জামান মীরগঞ্জের একটি স্কুল গঙ্গে স্পরিবারে আছেন। ছুটলাম তাঁদের ঘোঁজে। ডক্টর জামানের শুভ্র বাড়ীর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। দুঃসময়ে ওদের একবার দেখবার জন্যেও মন ব্যাকুল। কিন্তু বাজারে পৌছে শুনলাম রাত শেষেই তাঁরা মোকা করে চলে গেছেন। কোথায়, কেউ জানে না। ছয়ই এপ্রিলের পর যে তিনচারদিন বাঙ্গলাদেশের স্বাধীনতার সৈনিকেরা রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণ ভার নেয়, তখন তাদের পক্ষ হয়ে উচ্চর ওয়ালিউজ্জামান রাজশাহী বেতার কেন্দ্র চালু করার চেষ্টা করেন। এত বড় অপরাধের পর সেনাবাহিনীর অভিযানের খবর পেয়ে তাঁর পক্ষে রাজশাহীর অবস্থান আর সঙ্গ ছিল না।

তেরোই এপ্রিল শেষ বিকেল নাগদ পাক সেনাদের জ্বালাও পোড়াও হত্যায় চারঘণ্টা ও আশেপাশের এলাকার মানুষের এদিক ওদিকে ঝুঁকিক ছোটাছুটি ! বিদ্যুৎ গতিতে মীরগঞ্জেও তার সেই থাকা। গ্রামের মানুষ মহিলা শিশু দুর্ঘ যুবক সবাই ছুটছে পাগলের মতো। নিরাপত্তার আশায় এক গ্রামের মানুষ পাশের গ্রামে হয়তো আশ্রয় নিছে, আবার সেই আশ্রয়দানকারী গ্রামের মানুষ হয়ত নিরাপত্তার পেঁজেই ছুটছে তাদের পাশের গ্রামে। কারো কারো বগলে ছেটো পুঁটুলি, তবে অধিকাংশ মানুষই এক ব্যত্র। তয়ার মানুষের এই ছোটাছুটি ও ঢিঁকারে আমাদেরও স্মাধু অস্ত্রি। বহুদূরে কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওইতো পাক সেনাদের বিজয় অভিযানের আলামত। ওরা আসছে। ধৰ্মসের আগুন ছড়াতে ছড়াতে ওরা আসছে। ভয়ঙ্কর এক মৃত্যু যেন এদিকেই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে। আমরা সবাই দিশেহারা। কি করবো, কোথায় যাবো। এদিক ওদিক দোড়াদৌড়ি করেই বা কতদুর যেতে পারবো। কিন্তু মীরগঞ্জেও এক মুহূর্ত থাকা যাচ্ছে না। সেখানে একদণ্ড কালক্ষয় মানে নির্যাত মৃত্যু। অশরীরী কালো উড়ন্ট শুকনির মতো আমাদের চারপাশে তয় ডানা মেলে। এক কাপড়ে আমরা ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। ওই সময় কে যেন বললো, সেরিকালচার ফার্মের এক প্রাণ্তে মাটির নিচে বিশাল একটি ঘর আছে, সেখানে লুকিয়ে থাকলে কেউ টের পাবে না। এমন চমৎকার লুকোবার স্থান কাছাকাছি আছে শোনা মাত্র সবাই সেদিকে ছুটলাম। অসুস্থ পুত্র পেটো আমার কোলে। এভাবে একটু ছুটতেই হাঁপিয়ে গেছি, বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটাপেটি টের পাছি আমি। অল্পক্ষণেই সেই মাটির নিচের ঘরটি পাওয়া গেল। ঘর তো নয়, বিরাট এক গর্ত, তার চর দেয়াল ও মেঝে সিফেট লেপা। একটি কামরার মতো গভীর এক চৌবাচ্চা। আমরা কয়েকজন সেখানে লুকিয়ে থাকলে, উপর থেকে ঠিক বোঝা যাবে না। গর্তের মুখ কিছুটা ঢাকারও ব্যবস্থা আছে, অতএব স্থানটি বেশ

নিরাপদ। তাই চটপট মই লাগিয়ে আমরা দুতিনটি পরিবার সেই চৌবাচ্চায় একে একে নামলাম। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হলেও আমাদের ঠাই হলো। কিন্তু একি। অল্প আলোয় উপর থেকে এতক্ষণ চৌবাচ্চার মেঝেটা ঠিক দেখা যায়নি। প্রচণ্ড দুর্জন্ধে তক্ষুণি বোকা গেল আমরা এক নরককুণ্ডে নেমে পড়েছি। চৌবাচ্চার মেঝের এখানে সেখানে শূপ হয়ে আছে মানুষের মল। কতকাল ধরে যে এখানে এসে কত মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিছে, তা কে জানে। সেখান থেকে উঠে আসার সাহস আমাদের নেই। তখনও উপরে শোনা যাচ্ছে দূরে গ্রামের মানুষের চিকিৎসার কাম্মা ছোটাছুটি। নিরূপায় আমরা। নাক মুখ ঢেকে দম প্রায় বক্ষ করে পাকসেনাদের পায়ের আওয়াজ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলাম সেই নরককুণ্ডে। উভয় সংকটে প্রাণ রক্ষাই প্রধান ব্যাপার।

অবিশ্বাস্য সেই দুর্জন্ধে চোখ মুখ নাক বক্ষ করে নিঃশব্দে আমরা কতক্ষণ ছিলাম, জানি না। তখন এক ঘিনিটি মানে একদিন। এক সময়ে মাথার উপরে ছোটাছুটি চেচামেটি থেমে গেল। কারো সাড়া নেই। কে যেন চৌবাচ্চার মুখে এসে বললো, পাকসেনারা বোধহ্য এদিকে আসছে না, চারঘাটের আগন্তনের ধোঁয়া আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা উঠে পড়লাম।

ভয় আর আতঙ্কে রাতভর ঠায় বসে থাকা আবার শুরু হলো। এক এক সময়ে উড় উড় খবর আসে, আর আমরা কয়েকটি পরিবার ছোটাছুটি করে একবার এখানে একবার ওখানে একটু সরে থাকার চেষ্টা করি। কারণ আমাদের ধরণে, পাকা বাড়ি দেখলেই পাকসেনারা চুকবে।

মুজিব নগর সরকার শপথ নিলেন। কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে করলেন। দিল্লীর পাকিস্তান দূতাবাসেও আমার সহপাঠী আমজাদুল হক ও তার সহকর্মী একইভাবে পাকিস্তানের গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানালেন। সংবাদ পরিক্রমায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য তখন আমাদের আনন্দ বেদনায় ক্ষেত্রে উত্তেজনায় সাহসে শপথে প্রচণ্ড শক্তির স্ফূলিঙ্গ অনুভবে ভাসিয়ে নিছে।। ক্রোধে ধ্যায় বল্লমুখ হয়ে উঠছে আমাদের এক একটি মন। ত্রৈদাসের মতো মুখে ধূবড়ে বেঁচে লাভ কি? মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। জীবন তুচ্ছ করে সবাইকে একসাথে লড়তে হবে। আজকের এই লড়াইয়ের সুফল হয়ত কোনোদিন পাবে পরবর্তী প্রজন্ম। এখন সব বিদ্যুৎ ভাবনা যখন যমূর্ত্তি মনকে এক একবার দম্প করে চাঁড়া করেছ, ঠিক তখনই আবার ভুল্টা হয়ে গেল। অনিচ্ছিত অচেনা পথে হাঁটা তো সহজ নয়। পকেট প্রায় শূন্য। সত্যি বলতে, গ্রামের কজন সজ্জন ব্যক্তির টুকটাক উপহার সামগ্ৰীর উপর আমাদের তখন নির্ভরতা। দুদিন চলার মতো সম্মত নেই। সীমান্ত পার হয়ে কোথাও পৌছে একটা কিছু পাওয়াও সময় সাপেক্ষ। অসুস্থ পুত্রের শুধুপথ্য চিকিৎসা, সুন্দরী শ্যালিকার সম্ভ্রম রক্ষার দুশ্চিন্তা, সবচেয়ে বড় কথা পুরো সংসার ফেলে যাওয়া, তো সে যেমনই হোক সংসার তো, যেখানে এক একটি ছোটো বস্তুর সাথেও আবেগ কিংবা স্মৃতি জড়িয়ে তাকে অমূল্য করে তোলে—কত সমস্যাই না তখন সামনে। অথচ দেশের মাটিতে একদণ্ড দাঁড়াবার ভরসাও নাই।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো এক সক্ষায় রাজশাহী বেতার কেন্দ্র চালু হতেই ভেসে

এলো ভাইস চাম্পেলর ডষ্টের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কঠস্বর। রাজশাহীতে হানাদার দখলদার পাকসেনাদের প্রশংসায় বাগো বাগো হয়ে তিনি বললেন, তাদের চেষ্টায় রাজশাহীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানালেন, রাজশাহী শহরে পানি, বিদ্যুৎ, হাটবাজার, যানবাহন সবই নিয়মিত। তিনি আরো বললেন, ক্যাম্পাসত্যাগী শিক্ষক কর্মচারী প্রায় সকলেই ক্যাম্পাসে ফিরেছেন, দু'একজন বাকি, আশা করা যাচ্ছে তারাও ফিরবেন দু'একদিনের মধ্যে। রাজশাহী সম্পর্কে মিথ্যে গুজবে বিশ্বাস না করার জন্য সবাইকে তিনি অনুরোধ জানালেন। ডষ্টের হোসায়েন কি বন্দুকের নলের সামনে এতবড় মিথ্যে সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন? কিন্তু তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপে তার সামান্যতম কোন প্রমাণও পাওয়া গেল না। এমন কি বিদেশের মাটিতে দাঢ়িয়েও তিনি বেতারে সংবাদপ্তে একরাশ মিথ্যে ছড়ালেন।

কিন্তু সেদিন আমার শিক্ষকের ওই বেতার ভাষণ আমাকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করে ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে ডঃ হোসায়েনের আন্তরিক আগ্রহ আমাকে অভিভূত করে। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার আর কোন সংশয় ছিল না। ক্যাম্পাস ত্যাগের আগেও ভেবেছি তিনি আমাদেরই লোক।

সরকারী ঘোষণা ছিল একূশে এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেক কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মস্থানে যোগদান করতে হবে, নইলে তার কর্মচূতি। আমাদের সিজান্ত নেওয়া বড়ই জরুরী। কি করি! শেষ পর্যন্ত যদি দেশে থাকতেই হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেই হয়, তাহলে একূশে এপ্রিলের মধ্যেই কর্মস্থানে পৌছানো দরকার। ভাইস চাম্পেলর স্বয়ং যখন এতখানি নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন ভাবো কি। তাছাড়া সত্যি সতিই কত লোক দেশ ত্যাগ করেছে আর ওপারে গিয়ে অফিসের কি দশা হচ্ছে, তখনও ঠিক পরিষ্কার নয় সেই ছবি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর যে সব জওয়ান নদী পার হয়ে এসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তাঁরাও একটি ব্যাপারে বারবার আমাদের নিষেধ করতেন। তাঁদের কথা, খুব বেশী প্রয়োজন না হলে যেন আমরা কেউ দেশ ত্যাগ না করি, কেননা বেশী লোক দেশ ত্যাগ করলে অবহু তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। যেহেতু হিন্দুরাই পাক সেনাদের প্রথম টাগেটি, সেজন্য সীমান্ত অতিক্রমের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রাধিকার, আমরা সেটা উপলব্ধি করতাম। আসলেই মধ্য এপ্রিলের আগে খুব বেশী লোক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়নি। দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার চেষ্টা সবাই কম বেশী করেছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে পাক সেনাদের নির্যাতনে এপ্রিল শেষ নাগাদ দেশত্যাগীর সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং কয়েক মাসেই তা এক কোটিতে পৌছে।

ক্যাম্পাসে ফিরব কি ফিরব না, এমনি নানা ভাবনা-চিন্তা ভয়-অনিচ্ছয়তা আশ্বাস-নির্ভরতা ও আবেগ-বিশ্বাসের টানা পোড়নে দুলতে দুলতে শেষ পর্যন্ত একদিন টমটমে উঠলাম রাজশাহীর পথে। সেরিকালচার ফার্মে আশ্রয় গ্রহণকারী অন্যান্য পরিবার আমাদের বিদায় দিয়ে অনুরোধ জানালেন, আমরা যেন তাদের খবর দিই যদি অনুকূল হয় পরিস্থিতি। অর্থাৎ টেস্ট কেস হিশাবে আমরা স্বেচ্ছায় চলেছি লুঞ্চ, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের এক বন্দী শিবিরে।

বানেশ্বর-সরদহ মোড়ে টমটমে পৌছাতেই ভয়ে আতঙ্কে আমার হাত পায়ে কঁপন। সেনাবাহিনীর একটি বিশাল বহর রাজশাহী থেকে নাটোর মুখে চলমান। এমনভাবে

আধমাইল লম্বা এক ভয়ঙ্কর অজগরের সামনে পড়তে হবে কল্পনাও করিনি। রাত্তার পাশে দাঁড়ালো টমটম। তার উপরে আমরা সাতটি প্রাণী-চালক, তার পাশে আমি, পিছনে আমার স্ত্রী, শ্যালিকা, পুত্রকন্যা ও আমাদের কাজের ছেলেটি। একের পর এক জলপাই রঙের গাড়ী যাচ্ছে। কয়টি গাড়ী হিশাব নেই। তবে মনে ঘনে যে অনুমান ছিল, আশি নববাহিটির কম নয়। আমি টমটমের উপর উঠে দাঁড়ালাম। এক একটি গাড়ী আমাদের পাশ দিয়ে যায় আর আমি সেই প্রত্যেকটি গাড়ীকে কুর্নিশ করি। কৌতুদাস সুলভ আমার এই আচরণে আমার স্ত্রী মনে ঘনে দারুণ ক্ষুঁতি। পিছন থেকে খুব মনু স্বরে তাঁর নিষেধ জারী হলো— ‘বসে পড়ো— অমন করছো কেন, ছি ছি।’ আমি তখন চোখে অঙ্ককার দেখছি— স্পষ্টই দেখছি চলমান গাড়ীর প্রত্যেকটি জওয়ানের লোলুপ চোখ বারবার আমার তরঙ্গী শ্যালিকার শরীরে আছড়ে পড়ছে, কোনো কোনো গাড়ীর চালক আবার টমটমের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ীর গতি কমিয়ে স্টিয়ারিং-এ এক হাত রেখে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে আমার শ্যালিকা ও স্ত্রীর প্রতি অসভ্য বাক্য ছুঁড়ে অন্য হাতে নোরা ইঁগিত করতে থাকলো। আমার চোখে তখন ধৰ্ষণ ও হত্যার দৃশ্য ভাসছে। আমার মনে হলো, যেমন করেই হোক আমাদের বাঁচতে হবে, এই বিপদ থেকে উঞ্জার পেতেই হবে। আর সেই জন্যই স্ত্রীর প্রবল আপত্তি সহেও আমার দু কান পর্যন্ত কৃতার্থ হাসি কেলিয়ে বত্রিশ পাটি দাত বের করে ডান হাত স্যালুটের মতো কিন্তু তালু উচ্চিয়ে চলমান প্রত্যেকটি গাড়ী ও সেখানে আরোহী নর পশুদের আমি ঘন ঘন কুর্নিশ করতে লাগলাম। প্রাণ রক্ষার জন্য আমার এই বানর কসরৎ বথা গেল না। সেই অজঙ্গীন কনভ্য এক সময় পার হয়ে গেল। শেষ গাড়ীটি চলে যাবার পর বিশ্বাস হলো আমরা বেঁচে আছি। ততক্ষণে তয়ে যেমে উঠেছি আমি। দ্রুত নিঃশ্বাস চলছে। টমটমঅলা বললেন, আঙ্গাহর ইচ্ছা তাই আজ আমরা বেঁচে গেলাম।

টমটম আবার ছুটলো। মনে ঘনে ভাবছি, রাজশাহী দখল করতে যে সেনাদলটি অভিযানে এসেছিলো, তারা বুঝি চলে গেল। এ রকম ধারণায় স্বত্ত্ব পেলাম একটু। কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী। বেলপুকুর রেলগেট পৌছে টমটম আবার থামলো। রেলগেট যদিও খোলা, দূরে টেন দেখা যাচ্ছে। টেন আসছে। তবে তো সবই ঠিকঠাক চলছে— ডক্টর হেসায়েন তাহলে সত্যিই-কি আশ্র্য। ঠিক এই সময়েই আশেপাশে কাছে দূরে চোখ পড়তেই ‘সব ঠিকঠাক চলছে’ কথাটি কেমন সত্যি, তা ধরা পড়ে গেল নিদারুণভাবে। এক সপ্তাহ আগে এই পথ ধরে পাকসেনাদের অভিযান চলেছে রাজশাহীর লক্ষ্যে। আর সেই অভিযানের স্বাক্ষর তখনও এদিক ওদিক ছড়ানো। কোথাও ঘরপোড়া সূপ, কোথাও গলিত লাশে শক্কনের মুখ। এক মুহূর্তে মনে হলো, এক মুহূর্তের নগরীর পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। ফেরার বাস্তা বন্ধ। নিরূপায় আমরা। ইতিমধ্যে ছাইসেল বাজিয়ে টেন এলো। ধীর গতি। গোটা টেন ভর্তি হানাদার সৈন্য চলেছে সুশ্রবণী ‘অভিমুখে। বহু জওয়ান টেনের দরজার হাতেগুল এক হাতে ধরে ঝুলছে, আর তাদের অন্য হাত নেড়ে তারা ফুর্তি এবং বিজয় মুদ্রার সংকেত জানাচ্ছে। দু দাঁতকপাটি কেলিয়ে দু হাত শুন্যে দুলিয়ে আমিও তাদের অভিনন্দন জানালাম। কি দুঃসহ সেই অভিনয়! কিন্তু এটুকু না করলে কে জানে একটি গুলি হয়ত এই দূর থেকে ছুটে এসে আমাদের বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। আমার স্ত্রী বললেন, ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?’

‘থামো আগে বাঁচতে দাও।’ আমার গলা কাঁপছে, টের পাছি।

বানেশ্বর সরদহ মোড়ে সেনাবাহিনীর দীর্ঘ কনভয় পার হবার পর যেমন মনে হয়েছিল নতুন জীবন পেলাম, টেনটি চলে যাবার পর কিন্তু তেমন আর আশ্বস্ত হতে পারলাম না। অজ্ঞান আশঙ্কায় শরীরে মনু কাঁপন শুরু হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদন্পুর গেট পর্যন্ত আসতেই যে সব দৃশ্য চোখে পড়লো, তার ফলে আর আশা নেই। তখন শুধু একটি ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠছে, আমার হাতের আঙুলগুলি আমি কামড়াই। তবেও শেষ ক্ষীণ আশা, পাকসেনারা হয়ত উৎপাত করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছেড়ে এতদিনে চলে গেছে। আশা কুঁকিনী বটে! বিনোদন্পুর গেট দিয়ে ঢুকে বাঁয়ে ঘুরে একটু এগাতেই দেখি তৎকালীন জিনাহ হলের প্রত্যেকটি জানালায় স্যাণ্ডো গেঞ্জি ও খাকী প্যান্ট পরা মানুষের মুখ। এমনটি দেখবার জন্য আমি প্রস্তুত নই। তার মানে ওরা ওই জওয়ানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র এখনও দখল নিয়ে বসে আছে এবং আমরা ওদের সেই ঝাঁচায় আন্ত উজ্জ্বলের মতো ঢুকে পড়েছি! এবার আমার শ্বারীও একটু বিচলিত হলেন। বারবার তিনি অনুশোচনা করতে লাগলেন—‘আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি, আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা ভুল করেছি। আমি।’ ‘যা হবার তাই হবে। এখন ভেবে লাভ নেই।’ তাকে আর কি বলবো! এভাবেই সাম্রাজ্য দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রশাসন ভবনের সামনে শহীদ ডঃ জোহার মাজারের কাছে আসতেই কোথেকে এগিয়ে এলেন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আশীর্বাদ জামান শুকনো শুকনো মুখ।

‘কোথায় যাচ্ছেন? আপনার বাসায় কিছু নেই। সব লুঠ।’

অর্থাৎ যে সাধের সংসার আবেগ জড়ান্তে টুকিটাকি ফেলে হেতে আমাদের এত মায়া, তার কিছুই নেই।

ক্যাম্পাসের পথে চলতে চলতে চলতে ক্ষণে হেদিকে চোখ গেল, শুধু পাকসেনাদের চলাফেরা। বিজ্ঞান ভবন, কলা ভবন, জুবেরী ভবন সর্বত্রই ওদের দেখা যাচ্ছে। ভাইস চাক্সেলের বাসভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীরা একে একে জড়ে হচ্ছেন তখন। রেডিওতে সামরিক কর্তৃপক্ষের হকুম অনুযায়ী ওরা সবাই কর্মসূল রিপোর্ট করতে এসেছেন। প্রায় সকলেরই পরা লুঙ্গি, পায়ে জুতো স্যাণ্ডেল নেই, ময়লা জামা কাপড়, চুলে ধূলোবালি, চোখ মুখ ডায় আতঙ্কে ফ্যাকাশে, কারো মুখে কথা নেই। বোবার মতো সবাই দাঁড়িয়ে গুটিশুটি জড়োসড়ো—যেন কি করবে কেউ বুঝতে পারছেন না। পরম্পরার পরম্পরাকে শুধু দেখছেন। হঠাৎ আমাকে সপরিবারে ফিরতে দেখে তাঁদের চোখ কপালে উঠে গেল। নিষ্পলক পরম্পরার দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ কথার বিনিয়ম হয়ে গেল। দুঃখে ক্ষোভে আমাদের কান্না পাচ্ছে। কি ভুলটাই না করেছি। শেষে কি না এ দেশে ক্রীতদাসের মতো আমাদের বাঁচতে হবে।

* আমাদের ফ্লাটে ফিরে এলাম। আশেপাশে প্রতিবেশী তেমন কেউ নেই। আমাদের দালানে আমরাই প্রথম। দক্ষিণ পাশের দালানে কেউ নেই। তার পরের দালানটিতে সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল ঘাঁটি গেড়েছে। আমাদের পাড়ার প্রায় সব কটি ফ্লাটের মূল্যবান মালামাল পাকজওয়ানেরা লুঠ করেছে। পাড়ার পাঁচটি দালানের একটিতে ওদের ঘাঁটি, বাকী চারটির প্রায় সব কটি ফ্লাটের দরজা জানালা পাট পাট খেলা। অর্থাৎ এই সব ফ্লাটে

যথেষ্ঠ লুঠতরাঙ্গ হয়েছে। একটি ফ্লাট অবশ্য অক্ষত। সেখানে আমার সহকর্মী ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদ সপরিবারে বহাল তবিয়তে। ওই সময়ে তাঁর মেজাজ প্রফুল্ল এবং তাঁর স্বাস্থ্য চেহারা পোশাক আশাকেও লক্ষণীয় উন্নতি। আমাদের ফিরতে দেখে তাঁর স্ত্রী আমাদের অভয় দিলেন, ‘কোনো ভয় নেই, কোন অসুবিধা নেই।’ অসুবিধা আর কি। চারপাশেই তো দেশ প্রেমিক জগতের কাছে সামান্য কাপড় জড়িয়ে স্থান করছে, কেউ কেউ শিক্ষকদের সাজানো বাগানের বেড়া ভেঙে খড়ির মতো একত্র করছে, কেউ কেউ আশেপাশের গ্রাম থেকে মূরগী ছাগল ধরে ধরে এনে হালাল করছে। কেউ কেউ আবার ডিউচিতে অর্ধাং আমাদের পাড়ার কোনো কোনো পয়েন্টে হালকা অস্ত্র ক্যামেরার মত তিন পায়ে বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুটতে পারে যে কোন দিকে।

দোতলার ফ্লাটে ঢুকলাম আমরা। ঘরের সব কিছু লগুড়ও। বেশীর ভাগ জিনিষপত্র উৎপাদ, এমনকি কোনো কোনো বিছানার তোশক গদী পর্যন্ত। যা আছে সব ছড়ানো ঘরময়। আমাদের ঘরের এই হাল দেখে টমটমআলা পর্যন্ত বিচলিত। তিনি ভাড়া নেবেন না। অনেক অনুরোধে টাকা নিয়ে অনুশোচনা করলেন ‘এখানে এমন অবস্থা জানলে কিছুতেই এখানে আপনাদের আনতাম না। আগে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।’

সাধের সংসারের চেহারাঃ আমার স্ত্রী আবারও ভেঙে পড়লেনঃ দারুণ ভুল হয়ে গেছে। দারুণ।’

‘আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। এখন ভেঙে কি লাভ।’ আবার শাস্ত করি তাঁকে।

‘শুধু আমাদের কথা নয়,’ আমার স্ত্রী কলেন, ‘অসুস্থ ছেলেটিকে কিছু খাওয়ানো দরকার। আমরা না হয় একদিন না-ই প্রেক্ষিত কিছু।’

‘ঘরে কিছুই নেই?’

‘কই কিছুই তো দেখছি না।’

আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিলেন আমার স্ত্রীঃ ‘যা হয় আনো।’

আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ভাইস চাম্পেলারের বাসায় গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। সেখানে নাকে খত্ত দিয়ে জানাতে হবে যে আমরা, এই আমরা, পরিব্রহ্মি ইসলামী পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর চির অনুগত দাসানুদাস, চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর নাগরিক বেজস্মা বঙ্গালি আমাদের অবাঙালি প্রভুদের প্রেমে পাগল হয়ে তাদের সেবার জন্য এবং জারজ মাটিতে ইসলাম কাহেম করার জন্য ফিরে এসেছি, দয়া করে প্রভুদের পায়ে আমাদের ঠাই দিন, আমাদের গ্রহণ করুন, আমাদের বিশ্বাস করুন, আমরা গান্ধার নই, আমরা দখলদার বাহিনী-চির ক্রীতদাস, আমরা। ভাইস চাম্পেলর ডঃ হোসায়েন ও রেজিস্ট্রার মিঃ জোয়ার্দার সেদিন লাউঞ্জে বসে কাগজ কলম হাতে হাজিরা নিছিলেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদ এদিক ওদিক ছোটছুটি করছেন। এক একজন কর্মচারী রিপোর্ট করছেন, চলে যাচ্ছেন। নিরীহ শাস্ত শাবকের মতো তাদের আচরণ। আমি লাউঞ্জে ঢুকতেই ডঃ হোসায়েন একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠলেনঃ ‘এই যে তুমি এসে গেছ, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।’

‘আমার বিরুদ্ধে? কেন স্যার? আমি তো এখানে ছিলাম না। এইমাত্র এলাম! বিপদ

সংকেতে আমি ভীত হয়ে পড়ি।

‘সে তুমি হেরানেই থাকো, তাতে আসে যায় না। তোমার অফিস ঘরেই ই.পি.আর. এর হেলমেট পাওয়া গেছে, আর সেখানেই হাবিব ব্যাংক লুঠ করা টাকার ভাগবাটোয়ারা হয়েছে।’

‘সত্যি বলছি স্যার আমি কিছুই জানি না। আপনি তো জানেন, আমি সেই হয় তারিখে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছি। স্যার আমি কিছুই জানিনা স্যার।’ প্রায় কেবলই ফেললাম আমি।

আমার অবস্থা দেখে বোধহয় ডঃ হোসায়েনের একটু মায়া হলো। বললেন ‘আচ্ছা এখন যাও।’

মনে এক প্রকাণ্ড বোঝা আর দুঃস্তা নিয়ে ভাইস চাস্পেলর ভবন থেকে বেরোতেই আমার নফতরের কর্মচারী আলতাফ হোসেন, আবুল বাশার ও আব্দুল আজিজের সাথে দেখা। তাঁদের বললাম আমার বিকলে কী অভিযোগ উঠেছে। গুরু বললেন, ‘হেলমেট তো সেই পর্যবেক্ষণ সালের যুক্তের সময়কার, তখন সিডিল ডিফেন্সের সাময়িক ক্যাম্প ছিল আমাদের অফিস। ও রকম হেলমেট আরে আছে পুরোনো কাগজের স্ক্রিপের পিছনে।’ হেলমেটের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যাংক লুট করে আমার অফিস টাকা ভাগ বাটোয়ার বিষয়টি তক্ষণি স্পষ্ট হলো না। পরে হেদিন অফিস খোলা হল, দেখি ব্যাংকের ছেটো ছেটো স্লিপ ঘরময় ছড়ানো। এ রকম স্লিপ ঘরটের বাতিলে আঁটা থাকে। কথা তাহলে মিথ্যা নয়। ব্যাংকও লুট। পরবর্তীকালে একটী ব্যাংক লুটের তারিখটি অনুমান করা গেছে। আর তারিখটি পেয়ে যাওয়ার বাকিটা বুকেত আমাদের অসুবিধা ছিল না। হাবিব ব্যাংক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখাটি পার্কসেনারাই লুট করে। তারিখ তেরেই অথবা তৌরেই এপ্রিল। যে দুএকজন নিরীহ শিক্ষক ওই সময়ে ক্যাম্পাসে ছিলেন, তারা বাবেই এপ্রিল পর্যন্ত প্রশাসন ভবনসহ ব্যাংকের দরজা ধ্বনীরীতি বন্ধ দেখেছেন, তখন পর্যন্ত সেখানে কোনো হামলা হয়নি। তাঁদের কাছেই শোনা গেল, সাতই থেকে এগারোই এপ্রিল এই পাঁচ দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করেন কিছু শিক্ষক কিছু ছাত্র ও ই.পি.আর বাহিনী। তখন পর্যন্ত পরিস্থিতির তেমন অবনতি হয়নি। সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক খালিদ হ্যাসান এই ক্যাম্পাসে একবার আসেন সৈনিকের মতো, হাতে রাইফেল। খালিদ হ্যাসানের সেই বীরত্বের কথা শুনতে ভালোই লাগলো। মানুষটার দূরদর্শিতা আছে, সাহস আছে। আর আমি? আত্মগ্লানিতে বিহিয়ে যায় মন। একটি নরকের কীটের মতো জীবনধারণ করে চলেছি! বাঙলাদেশের সৈনিকরা শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শক্তির বিকল্পে রুখে দাঢ়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো ওই কদিন। তবুও শেষ রক্ষা করা যায়নি। কটাই বা অস্ত্র ওদের হাতে। সুসংজ্ঞিত একটি বড় সেনাদলের মুখোমুখি লড়াইয়ের প্রস্তুতি কোথায়। সবাইকে তাই পিছু হাতে হয়েছে, ওপারে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবে পালিয়ে যাওয়া তো নয়, রণকোশল। ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্র নূরুল ইসলামের ভূমিকাও ছিল দারুল সাহসী। স্বাধীনতার পক্ষে সে অস্ত্র ধরে এবং কিছু কিছু পাকিস্তানী তাবেদারকেও সে চিহ্নিত করে। কিন্তু উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কিছু শিক্ষকের মধ্যস্থতায় এবং তাঁদের মহানুভবতার কারণে কোনো অঘটন এবং ঘটেনি। তবে দুর্ঘটনা একেবারে ঘটেনি, তাও নয়। ভাইস চাস্পেলরের খাস জয়দার

আব্দুল মজিদ নিহত। অবাঙালিদের মধ্যে যে মানুষটি এদেশকে ভালোবাসতেন, এ দেশের মানুষের সাথে একাত্ম হ্বার চেষ্টায় তার একমাত্র সন্তান একটি কন্যাকেও এমাজউদ্দীন নামে এক বাঙালির হাতে তুলে দিলেন, শেষে কিনা তাঁরই এমন মর্মাত্মিক মৃত্যু। তবে ক্যাম্পাসের অবাঙালি শিক্ষকেরা সবাই ভালোই ছিলেন। কেউ উৎপাদিত ইননি, কারো গৃহে লুচিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় স্বাধীনতার পক্ষে সশস্ত্র সৈনিকদের সহনশীলতা আত্মসম্বরণ ও ধৈর্যের প্রমাণ সেখানে।

হেলমেট রহস্য স্পষ্ট হ্বার পর ওই একুশে এপিল আবার গেলাম ভাইস চাম্বেলর দরবারে। কর্মচারীদের কাছে হেলমেট সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম, তা সভচে নিবেদন করলাম। ডঃ হোসাহেন আমার কথা আদো শুনছেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি অন্য প্রসঙ্গ টেনে বললেন, ‘শোনো এক্ষুণি ক্যাম্পাসের শিক্ষকদের বাড়ী বাড়ী যাও, খবর দাও, বিকেলে আমার বাসায় ইকবাল দিবস। কুইক। সবাইকে বলো।’

ত্বকূম তামিলের জন্য আমি দ্রুত বেরিয়ে আসবো আসবো করছি, এবই মধ্যে কোনো এক কর্মচারী পরিবার হড়মুড় করে ভাইস চাম্বেলর ভবনের বারান্দায় উঠে পড়লো। কি ব্যাপার ! আশ্রয়প্রার্থী। কেন ! কর্মচারীর চোখ্মুখ ভয়ার্ট, বোবা। তবুও ডঃ হোসাহেনকে শুনতে হলো, তাঁরই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্ষণ হয়েছে। মা ও নাবালিকা কন্যা কেউ রেহাই পায়নি। ভাইস চাম্বেলর ভবনের পিছনে পিঅনদের কোআর্টারে সাময়িক আশ্রয় পেল ধর্ষিতা পরিবার। আমার উপস্থিতি এবার ডঃ হোসাহেনের অস্বত্ত্বির কারণ। এককণ আমার দাঙিয়ে থাকার কথা নয়। তবু ভয়েই হোক ও স্বাভাবিক কৌতুহলেই হোক ওই স্থান ছেড়ে যেতেও পারিনি আমি। আমাকে অঙ্গুলে ডেকে ডঃ হোসাহেন বললেন 'you are the third man to know it' (প্রথম ব্যক্তি সন্তুষ্ট তিনি, দ্বিতীয় ব্যক্তি সৈয়দ ইবনে আহমদ) 'যদি তুমি কোথাও ফাঁস করো, আমাদের জওয়ানেরা এইসব করে বেড়াচ্ছে, তাহলে তোমাকে কিন্তু বাঁচাতে পারবো না। সাবধান।' পরবর্তীকালে আরো একবার পাকিস্তানী জওয়ানদের দুর্কর্ম ডঃ হোসাহেনকে গোপন করতে হয়। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চাম্বেলর। নয়ই নভেম্বর যঙ্গলবার রাতে চল্লিশ জন জওয়ান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে ঢুকে যে নারকীয় দৃশ্য রচনা করে, তা ও ভাইস চাম্বেলরকে হজম করতে হয়। পরদিন দুপুরে আই, জি, চীফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে মেহেদের হল ঘুরে ফিরে দেখলেন ভাইস চাম্বেলর, তারপর তিনি বললেন : সশস্ত্র দৃঢ়ত্বকারীরা রোকেয়া হলে ঢুকেছিল। কিন্তু কারা এই দৃঢ়ত্বকারী সে কথা স্পষ্ট উচ্চারণ তিনি করতে পারলেন না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ হচ্ছে এ কথা জেনে আমার ভিতরটা তৎক্ষণাত কেপে উঠলো। শ্বাস ও শ্যালিকা বাসায়। তাঁদের কি হাল এখন কে জানে। পুত্র কন্যা ও কাজের ছেলেটিই বা কেমন আছে ! স্ত্রীর দেওয়া সেই পাঁচ টাকা তখনও পকেটে। অসুস্থ পুত্রের জন্য কিছু খাদ্য চাই—ভোবেই হোক তা জোগাড় করে বাসায় পাঠাতে হবে। ভাইস চাম্বেলরের গাড়ীর ড্রাইভার আব্দুল বায়ীকে টাকাটা দিয়ে বললাম 'যা হোক খাবার একটা কিছু চাই অসুস্থ ছেলের জন্য।' বাজ্বা হাট নেই, ড্রাইভার বলেই গাড়ী নিয়ে তাঁকে এন্দিক ওদিক ছুটতে হচ্ছে, তাই কোথাও পেতেও পারেন। একটুকুই তরস।

ইকবাল জন্মবায়িকী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ সবাইকে পৌছে দেবার জন্য ক্যাম্পাসের একটি

বাড়ী ঘুরতে লাগলাম। চড়া রোদে হাঁটাইটি কত কষ্ট লাগে। সেদিন কিছুই মনে হয়নি। চারদিকে পাকসেনার চলাফেরা যথারীতি। ওদের কেউ সামনে পড়লেই আমি এক গাল হাসি ফুটিয়ে লম্বা সালাম ঠুকে বলছি আস্ সালামু আলায়কুম। ওরা কিন্তু খুব ব্যস্ত। আমার সালামের জবাব কেউ কেউ দেয়, আবাব কেউ কেউ ছিল দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকায়। অমনি আমার ভিতরটা শুকিয়ে আসে, আমাকে সন্দেহ করছে না তো, আমার অভিনয় কি ধরা পড়ে গেল !

ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, যে কোআর্টারে মানুষজন আছে, সে বাসায় দরজা জানালা বঙ্গ, আর যে বাসায় কেউ নেই, মালামাল লুচিত, তার দরজা কপাট চারদিকে হা করে আছে। অমনি ঘুরতে ঘুরতে গণিত বিভাগের অধ্যাপক হবিবুর রহমান সাহেবের বাসার সামনে পৌছে যাই। টুইন কোআর্ট র ১৯ বি নম্বর। মনে মনে খুশী হই, তাহলে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক রহমান আছেন। মানুষটির সাহস বটে। দরজার কড়া নড়াতেই ভিতর থেকে মহিলা কষ্ট : ‘কোন হ্যায় ?’ আমি অবাক : তবে কি অধ্যাপক রহমান নেই, আর এই মধ্যে তাঁর বাসা এক অবাঙালি পরিবার বেদখল করে ফেলেছে। তবুও বললাম : ‘মেহেরবানি করকে দরওয়াজা খুলিয়ে।’ কপাট খুললো। অধ্যাপক রহমানের স্ত্রী, আধাদের ভাবী দাঁড়িয়ে। দোতলায় ওঠার সিডিতে ধাপে ধাপে রেলিং জাপটে পরপর দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেমেয়েরা। সকলের চোখ মুখ আগুনে ঝলসে গেছে। পোড়া পোড়া ছোপ ছোপ দাগ। ঘৰে বিশ্বস্ত চেহরা। বোবা দৃষ্টি, অতল শৃন্যতা। তয় এবং উত্তেজনায় আমি অস্ত্রি। ক্ষীণ আর্তস্বরে জানতে চাইলাম, কী হয়েছে ডাবী বললেন :

‘কেন, আপনি জানেন না ওকে নিয়ে গেছে?’
‘এ্য় ?’
‘সুখরঞ্জন সম্যাদ্বারকেও নিয়ে গেছে।’
‘কবে ?’
‘চৌদ্দই এপ্রিল।’

তারপর কি হয়েছে আর বলার দরকার কি। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাথে পাক জওয়ানেরা সদাচরণ করছে বলে রেডিও ভাসণে যে তার প্রশংসনো করলেন ডঃ হোসায়েন, সে সবই সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা। অধ্যাপক রহমানের বাসা থেকে বেরিয়ে আর কোথাও যাবার সাহস নেই, কোথাও যাওয়া নিরাপদ নহ। কি জানি কোথায় কি শূন্তে হয়, কোথায় কি দেখতে হয়। ততক্ষণে বেশ কজনকে বিকেলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে গেছে। ভাবছি বাসায় ফেরা দরকার— ক্যাম্পাসের পথে ইটাই। ভাইস চাম্পেলেরে ড্রাইভার গাড়ীর ক্রেক করলেন আমার পাশে। এক ঠোঙা মুড়কি আমার হাতে দিয়ে ড্রাইভার বললেন, আর কিছু পাওয়া গেল না। আমি হাত পেতে নিলাম। যাহক কিছু খাবার তো। এই হচ্ছে রেডিওতে ভাইস চাম্পেলের বর্ণিত স্বাভাবিক বাজার হাটের নমুনা।

বাসায় ফিরতে এক সুন্দর চমক। শ্রী জানালেন, চাল, ডাল, তেল, মুন, স্টোরে যেমন ছিল, তেমনি আছে—পাকিস্তানী লুঠেরাদের লক্ষ্য ছিল দামী দামী জিনিশপত্র। তাহলে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। অন্ততঃ দু চারদিনের ভিত্তি অনাহাবে মত্তু হচ্ছে না। বিকেল নাগাদ আমরা সবাই কিছু খেতে পেছে বাঁচার আশা হেন একটু ঝলে উঠলো।

পাঁচটার পর ভাইস চাম্পেলর ভবনে ইকবাল জয়ল্লী। এখন ভবলে হাসি পায়, দেশের ওই পরিবহিতিতে ওই পরিবেশে শুই রকম অনুষ্ঠান কেমন করে সম্ভব ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর। লাউঞ্জে উপস্থিত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী আমরা দশ পনের জনের বেশী নই। তার মধ্যে চারপাঁচজন সামরিক কর্মকর্তা। গুরুগঙ্গার-ভাবেই অনুষ্ঠানের শুরু, যেন ওই মুহূর্তে এই দিবস পালন দেশ ও জাতির এক পরিব্রজ জরুরি দায়িত্ব। ভাইস চাম্পেলর ইংরেজী ভাষায় সূচনা বস্তু পেশ করার পর আলোচনা ও কবিতা পাঠ। কেউ কেউ স্বরচিত কবিতা শোনাবার মওকা পেলেন। ইংরেজী অথবা উর্দু ভাষায় অনুষ্ঠানের সব ব্যাটচিৎ। বাড়লা অলিখিতভাবে নিষিক্ষ। পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে বাড়লায় কিছু বলার ঝুঁকিও ছিল নিশ্চয়ই। তবে ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে ভাইস চাম্পেলর ডঃ মুহুম্মদ আব্দুল বারী সাধারণভাবে বাড়লায় বস্তু করতেন। হয়ত ডঃ বারী মাত্তাভাষ্য বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বেধ করেন বলেই বাড়লায় বস্তু দেন। কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর সময়ে পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে তাঁর বাড়লা বলার সাহস আমাকে মুগ্ধ ও আবেগ আল্পুত করে ফেলতো। ডঃ বারীর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠতো। কিন্তু তাঁর এই বাড়লা বস্তু আমার ভালো লাগলেও আমার সহকর্মী সৈয়দ ইবনে আহমদ এ ব্যাপারে শুব অস্বিত্ববোধ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেই ফেললেন, ডঃ বারীর উচিত ইংরেজীতে বলা, আর্থি অফিসারেরা শুনছেন, তাদের কাছে ইমেজ বিল্ড আপ করা দরকার, তিনি একজন অক্সোনিয়ান, তিনি কেন ইংরেজী বলবেন না?

ইকবাল দিবসের অনুষ্ঠান ভৱিত আয়োজিত হলেও চললো অনেক সময়। যাকে আবার মগরিডের বিরতি। শিক্ষক কর্মকর্তারা ভড়মুড় ভড়ঘাড়ি নামাজে দায়িয়ে গেলেন দোতলায় ওঠার পিড়ির মুখে। আমরা যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ইসলাম ধর্মের সাথে যে আমাদের কোনো বিরোধ নেই এ কথাটি ওই পাকিস্তানীদের বেঝানো প্রয়োজন। কাদের? ওই মেসব সামরিক কর্মকর্তারা তখন নামাজ মাটিপড়ে লাউঞ্জের সোফায় তাদের শরীর এলিয়ে পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকলেন এবং ভাইস চাম্পেলরও নামাজ না পড়ে থাদের সাথে কথা বলে সঙ্গদান করলেন, তাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে আমরা বিশ্বাসী মুসলমান। একাত্তরে এ দেশের সরল ধর্মভীকু মানুষের মুসলমানিত্ব কতভাবেই না পরখ করে দেখেছে ওই বেনামাজী পাঞ্চাবীরা। পথে ঘাটে চার কলমা বলে, সুরা ও নামাজের তরিকা বলে কিংবা স্তুরী সাথে শয়নপূর্ব দোয়াটি বলেও যদি রেহাই না পাওয়া গেছে, তখন ওদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ওদের নির্দেশ মতো কাপড় খুলে দাত কেলিয়ে বলতে হয়েছে এই দেখুন আমরা মুসলমান, এই যে পাকা প্রমাণ।

নামাজ ঠিক আমার রপ্ত ছিল না। অভ্যাসও নেই। তাই ইকবাল দিবস অনুষ্ঠান বিরতির ফাঁকে ভাইস চাম্পেলর ভবনের বাগানে পায়চারি করছি, এমন সময়ে সহকর্মী কলেজ পরিদর্শক ওমর ফারুকের কথায় চমকে উঠলাম। মদু কঢ়ে তিনি বললেন : ‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি মতুর ভয়ে নাভার্স হয়ে পড়েছেন।’ আরি মাথা নাড়লাম, তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। এবারে ফারুক সাহেবে স্পষ্ট প্রশ্ন করলেন : ‘আচ্ছা এখন আপনি যেমন আছেন, মতু কি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু?’

এই একটি ছেট প্রশ্ন আমার দৃষ্টির পর্দা সরিয়ে দিল। তাই তো! এমন করে বিষয়টি ভাবিনি। তাহলে আর এত ভয় পাছি কেন। আমার এই অত্যন্ত বিচক্ষণ সহকর্মী সেদিন

এমন করে আমার দৃষ্টি ও ভাবনা না ফেরালে হয়ত ওই বিশ্ববিদ্যালয় বন্দীশিবিরে আমি
দুএকদিনেই তখে আতঙ্কে দমবক্ষ হয়ে মরতাম।

আসলেই উপস্থিত বুজ্জিমত্তায় ফারুক সাহেবে অপরাজেয়। শুধু আমার মনে সহস
জোগাতেই যে অমন যুৎসই কথাটি তিনি বললেন, তাই নয়। দারুণ এক ড্যাবহ
পরিস্থিতির মাঝে যুৎসই কথা বলেই তিনি নিজেও রক্ষা পেলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাসে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিজয় অভিযানের প্রথম রাতে যখন
ক্যাম্পাসবাসী প্রায় সবাই মৃত্যুর পায়ের শব্দ পাচ্ছে, ঠিক সেই দারুণ মুহূর্তে কজন
জওয়ান সঙ্গে কর্ণেল তাজ এলেন ফারুক সাহেবের টুইন কোআর্টারে। দরজার কড়া
বাজলো শুব জোরে। ফারুক সাহেবে প্রায় দৌড়ে নিচে নেমে দরজা খুলেই কর্ণেল তাজকে
সরাসরি চার্জ করলেনঃ

'Why are you so late? We have been waiting for you for so many days?'

একটি বাক্য যেন ম্যাজিকের মতো কর্ণেল তাজের উপর ছায়া ফেলে। তবুও কথাবার্তার
ফাঁকে ফাঁকে বাসার অন্যান্য সবার দিকে তাকালেন কর্ণেল। একে একে দেখলেন কেউ
সন্দেহভাজন কিনা। অমনি একজনকে পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। এক যুবক, সুদূর ঢাক্ষ।
ফারুক সাহেবের আত্মীয় মাহবুব হেসেন খানের কর্মচারী। এমন একজনকে ফেলে যেতে
পারেন না কর্ণেল তাজ। তাই বললেনঃ

'I want to take him.'

আবারও এক পরীক্ষার মুখোযুর্ধি ফারুক সাহেবের তাঁর উপস্থিত বুজি ও সাহসই চট
করে তাঁর কথা জোগালোঃ

'No, you can't.'

'Why?'

'There is nothing wrong with him.'

'Are you sure?'

'Of course. And if there's anything wrong, you come and shoot me
down.'

কর্ণেল তাজ এবাবে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। এমন করে দিনি কথা বলেন, নিচয়েই তিনি বন্ধু,
নির্ভরযোগ্য। ফারুক সাহেবের সাথেই কর্ণেল তাজ চললেন ভাইস চাম্পেল সমীক্ষে।
পরিচয় পর্বে উচ্চারিত হলো 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন'।
পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে ক্যাম্পাসবাসী সবাই যে ফারুক সাহেবের
মতো উপস্থিতবুজ্জির ভরসায় দু পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা কিন্তু নয়। যেমন একজন
অধ্যাপক তাঁর পরিবার পরিজন সবাইকে ফেলে তরতুর করে বাসার ছাদে উঠে পানির
ট্যাঙ্কের নিচে সারা রাত ফ্লাট হয়ে পড়ে রইলেন। সকাল হতেই দেখা গেল, স্থানটি বড়ই
মারাত্মক। চারদিকে সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে, অস্ত্র উচিয়ে আছে। ছাদের উপরে কোনো
মাথা দেখলেই শুলি ছুটতে পারে। অধ্যাপক তাই তেমনিই ফ্লাট। এদিকে তাঁর খোজ
পড়লো। দখলদার বাহিনীর একটি মাইক দরকার। কারফিউ সম্পর্কে ঘোষণা দিতে হবে।
ছাদে পলাতক অধ্যাপকের বিভাগে নাকি মাইক আছে, তারই খোজে খোজে সেনা

অফিসার সঙ্গে এলেন ভূগোল বিভাগের অবাঙালি অধ্যাপক প্যাটেল। গলা ছেড়ে চিংকার ডাকাডাকির পর অধ্যাপক প্যাটেল নিশ্চয়তা দেন, আস্ত্র করেন ‘কোঙ্গ ফিরে নেই’ নামুন কোনো ভয় নেই। কিন্তু নামা কি সহজ? ভয়ের তোড়ে অক্ষকারে তরতর কিভাবে ছাদে ওঠা গেছে, তাই যে ছাই মনে নেই। ছাদে ওঠার সিডিতো নেই। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজলেন তাঁর গ্যারেজে। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সেই গ্যারেজের দরজায় তালা ঝুলিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণলেন দ্রুয়ৎ রুমে। কেউ কেউ বাড়ীর দরজায় খাকী পোশাকী মানুষ দেখেই ভাবলেন প্রথম সাক্ষাতের বড় ঘুরমারি মোকাবেলায় তাঁদের স্তৰীরাই যোগ্যতর। দখলদার বাহিনীর প্রচণ্ড শুলিগোলার শব্দে স্বয়ং ভাইস চাম্পেল সেন্দিন আশ্রয় নেন টয়লেটে। কতভাবেই না ক্যাম্পাসবাসী শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সেন্দিন বাঁচার চেষ্টা করেছেন। কেউ বেঁচে গেছেন, কেউ বাঁচতে পারেন নি। কিন্তু তখন জীবন মৃত্যুর সংজ্ঞাই বা কি? ফারুক সাহেব সঠিক কথা বলেছেন যে এই জীবনের চেয়ে মৃত্যু কি আরো তয়স্ত? বাঁচা অথবা না বাঁচা কোনটি তখন অধিক অর্থবহু, অধিক ফলদায়ক!

একাত্তর চৌদ্দই এপ্রিল, সকাল। হিন্দুর রক্তপানের প্রবল তৃঝায় জীপডতি পাকসেনারা এলো ৭১ নম্বর দালানের সামনে। ওই দালানের নিচের তলায় একটি ফ্লাটে বাস করতেন ভাষা বিভাগের অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্বার। হিন্দু মুসলমান নিরিশেষে সবাই দেশ ত্যাগ করলেও অধ্যাপক সমাদ্বার মাটি কামড়ে ছিলেন। ব্রেথওয় যাননি। কেন যাবেন? তিনি হয়তো জ্ঞানতেন, তিনি নিরীহ নিরপরাখ, সাতে পঁচটি নেই, নির্লিঙ্গ সৎ নাগরিক। শুধুমাত্র বাঙালি হওয়াই যে পাকসেনাদের কাছে বড় অপরাধ এই সহজ কথাটি কি অধ্যাপক সমাদ্বার একেবারেই বোঝেন নি? না, তা নয়।

‘মরতে হয় দেশের মাটিতে মরবো জীবনীর হয়ত বাঁচবো না। তবে এ দেশ একদিন স্বাধীন হবেই।’ মৃত্যুর কদিন আগে হিন্দু উচ্চারণ করেছিলেন অধ্যাপক সমাদ্বার। শুধু তাই নয়। গান পাগল এই মানুষটি জীবনের শেষ কদিন কান্না জড়ানো গলায় কেবলই গাইতেন—‘আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি।’

‘ইধার কোঙ্গ হিন্দু আদমি হ্যায়?’ ফেরীঅলার মতো হাঁকাহাঁকি করলো সেই পাকসেনার দল।

‘হিন্দু ইধার নেই হ্যায়—’ এই মিথ্যা উচ্চারণ করে সেন্দিন তাদের ফেরাতে চেষ্টা করলেন অধ্যাপক সমাদ্বারের অবাঙালি প্রতিবেশী, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহুমদ জুনায়েদ।

কিন্তু রক্তপাণী মানুষ কি আর সহজে শান্ত হয়, তাদের ঠেকানো যায়? শেষ রক্ষা তাই হ্যানি। ‘সমাদ্বার নাম শুনে পাকসেনারা কিছু বুঝতে না পারলেও সবকিছু তাদের বাত্লে দেন মনোবিজ্ঞান বিভাগ অধ্যক্ষ ডঃ মতিউর রহমান ও ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক প্যাটেল। এই দুই অবাঙালি শিক্ষক তখন মহাপারাক্রমশালী ব্যক্তি। অধ্যাপক সমাদ্বারকে তাঁরাই শনাক্ত করলেন—এই তোমাদের হিন্দু শিকার।

তারপর কতজনের কাছে ছুটে ছুটে গেলেন শ্রীমতী চম্পা সমাদ্বার। তাঁর স্বামী কোথায়, কেউ বলেনা। এমন কি দুজন শনাক্তকারীও চুপ। ভাইস চাম্পেল ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন তাঁকে সাম্রাজ্য দেন— ঢাকায় আছেন তাঁর স্বামী। একাত্তর জুলাই মাসে

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসবাসী জনৈক দালাল শহীদ পত্নীর হাতে ফেরত দিলেন তাঁর স্বামীর চশমা ও স্যাণ্ডেল। বাহাস্তর সালের মার্চে ‘পূর্বদেশ’ সাক্ষাৎকারে এই ঘটনার উল্লেখ করলেন শহীদ পত্নী শ্রীমতী সমাদ্বার, কিন্তু কে সেই দালাল তাঁর মুখোশ আর উন্মোচন করলেন না। কেন! ‘বীরের এ রক্তস্ন্যাত মাতার এ অঙ্গ ধারায়’ অবশ্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নাম প্রকাশ করলেন : আইনজীবী শরিফ আহমদ (পূর্বদেশঃ ২৫ নভেম্বর ৭২)।

দেশ স্বাধীন হবার পর বাহাস্তর সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দক্ষিণে কাজলা গ্রামে পাওয়া গেল শহীদ সমাদ্বারের দেহাবশেষ। ওই গ্রামের যে কজন মানুষ এই লাশটি রাস্তায় পেয়ে তাকে মাটি চাপা দেন, সেই আব্দুল হাকিম, হারান মওল, জয়েনউদ্দিন, আসগর আলী, কানু, বসন্ত, ফজলু তাঁরাই দেখিয়ে দেন কোথায় শহীদ দেহাবশেষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃত্বন—যীর শওকত আলী ও মুকিয়োদ্ধা নূরুল ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই দেহাবশেষ পুণ্য আমানতের মতো তুল এনে স্থাপন করা হলো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে।

মধ্য একাত্তরের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অধ্যাপক সমাদ্বারকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যে বলার ঝুঁকি নিয়েছিলেন যে অবাঙালি অধ্যাপক, স্বাধীনতার পর তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ছিল আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন। ঢাকার মহম্মদপুরের বিভিন্ন পকেটে বাঙালি অবাঙালি উভয়ের বাস। কারো জন্মেন্ট নিরাপদ নয় সেই এলাকা। এমন স্থানেই আটকা পড়লেন অধ্যাপক জুনায়েদের শ্রী ও ছেলেমেয়ে। অবাঙালিদের পথ চলাচলে তখন দারণ ঝুঁকি। জুনায়েদ সাহেব ~~সন্দিত্ত~~ সন্দিত্তাগ্রস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সক্রিয় হলেন। অধ্যাপক জুনায়েদের শ্রী ও ছেলেমেয়েদের মহম্মদপুর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার সন্মতি আমারাই উপর অর্পিত হলো। আমি ভেবে দেখলাম, জহির রায়হানের মতো ~~নয়~~ করে কোনো পকেটে কোথাও চলে যাওয়া চলেন। মহম্মদপুরের অবাঙালিরা ভুল বুঝে কিন্তু হতে পারে কিংবা যেসব বাঙালি তরুণেরা সেখনে পাহারা দিছে, তারাও ভুল বুঝে একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। দুর্দিক সামাল দেয়া দরকার। তাই মুহম্মদ জুনায়েদের পরিবার সম্পর্কে প্রশংসনা ও আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ সম্বলিত একটি পত্র সংগ্রহীত হলো বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে। তারপর অবাঙালি বর্তু সাধারণিক ও বেতার সংবাদ পাঠক আখতার পায়ামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে তুল নিয়ে দুর্জনে গোলাম মহম্মদপুরে বেগম জুনায়েদের কাছে। আখতার পায়ামীকে সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—কোনো বাঙালি পথ রুখে দাঁড়ালে আমি কথা বলবো, আর হাঁ কোনো অবাঙালি বাধা দেয়, তাহলে আখতার পায়ামী মুখ খুলবে। বাঙালি তরুণ মুকিয়োদ্ধাৰাই যিরে ছিল ওই এলাকা। সুতৰাঁ আমাকেই সামাল দিতে হলো তাদের হাজার প্রশ়্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে জুনায়েদ পরিবার প্রথমে স্থানান্তরিত হলেন ঢাকায় আমার শুশ্রেব বাসায়, পরদিন রাজশাহীতে। (কি অস্তু যোগাযোগ! নগরবাড়ী থেকে সেই একই গাড়ীতে আনা হলো সৈয়দ ইবনে আহমদ সাহেবের শ্রীকে, পলাতক স্বামীকে দেখে ফিরিছিলেন তিনি)। তাতেও কি ঝণ পরিশোধ হয়ে যায়! মধ্য এপ্রিলে একটি বাঙালির জীবন বাঁচাতে কেন্দ্ৰ বাঙালি এমন মিথ্যে বলার ঝুঁকি নিতে পেরেছে!

ଆଗେ ବାଁଚାର ଜନ୍ୟ କୋନୋ ମିଥ୍ୟେର ଆଶ୍ରୟ, କୋନୋ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରେନ ନି ଗଣିତ ବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ହବିବୁର ରହମାନ। ପୃଷ୍ଠାବିତେ କତ ବ୍ୟାତିକ୍ରମୀ କତ ଆଶ୍ରୟ ପୂର୍ବ ଜୟ ନେୟ। ତିନି ତେମନିଇ ଏକଜନ। ମଧ୍ୟ ଏଥିଲେ ତା'ର ଅଞ୍ଚର୍ଧନେର ପର ତା'ର ବ୍ୟବହତ କୋନୋ କିଛୁଇ ଫିରିଯେ ଦିତେ ଏଲୋ ନା କେଉଁ। ଏକେବାରେ ବାତାସେ ଯେଣ ମିଲିଯେ ଗେଲ ତା'ର ଦେହବେଶେ। ସତିଇ କି ତାଇ? ଦଖଲଦାର ବାହିନୀର ତଂକାଳୀନ କୋନୋ ଦାଲାଳ କି ଏଥିନେ ବଲତେ ପାରେନ ନା କୋଥାଯା କବନ କି କରେ ଏହି ଘହନ ମାନୁଷଟିକେ ହତ୍ୟା କରେ ପୁଣେ ଫେଲା ହେଯେଛେ? ଆର କିଛୁ ନା ହେକ, ବହରେର ଏକଟି ଦିନେ ମେହି ଶାନେ ପୃଷ୍ଠାଧ୍ୟେର ମାଧ୍ୟମେ କିଛୁ ହଦ୍ୟ ଆବେଗ ଓ ଭାଲୋବାସା ତୋ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କରା ଯାଯା।

ଅଧ୍ୟାପକ ହବିବୁର ରହମାନେ ତା'ର ଶ୍ରୀ ଓ ଛେଲେମୟେର ଜୀବନେ ହଠାତ୍ ନେମେ ଏଲୋ ଏକ ମହା ଆତମକ ଓ ସଂକଟ। ଜାନୋଯାରେର ଦୃଢ଼ି ତଥନ୍ତି ଏହି ପରିବାରେର ଉପର ନିବନ୍ଧ। ଅଥଚ ଆଶେ ପାଶେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କେଉଁ ନେଇ, କେଉଁ ତାଦେର ସାଥେ ସଂସ୍କର ରାଖେନା। ଡମେ ତାଦେର ଛାଯା ମାଡ଼ାଯନା କେଉଁ, ପାଛେ ବିପଦ ଘଟେ। ଅବଶେଷେ ପ୍ରଫେସର ସାଲାହୁଡ଼ିନ ଆହମଦେର ଉଦ୍‌ଦ୍ୟୋଗେ ଏହି ନିଦାରଣ ଅସହ୍ୟ ପରିବାରକେ ଢାକାୟ ସରିଯେ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଲୋ। ଇତିହାସ ବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆତଫୂଳ ହାଇ ଶିବଳୀ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତ୍ବକ୍ଷେତ୍ରର ଛାଡ଼ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରଲେନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ସଦକର୍ଦ୍ଦିନ ଆହମଦ ଚୌଥୀ ଏଗିଯେ ଦିଲେନ ତା'ର ଗାଡ଼ୀ। ଛୋଟୋ ଗାଡ଼ୀତେ ସକଳେର ଶାନ ହଲୋ ନା। ତାଇ ଦୁଜନକେ କୋତେ ତୁଳ ଦିଯେ ତାର ପିଛନ ପିଛନ ଗାଡ଼ୀ ଚାଲିଯେ ଗେଲେନ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିବଳୀ। ନଗରବାଟୀ ଘାଟେ ଏକ ସାମରିକ ଉଂପାତେର ମୋକାବେଳାଓ କରଲେନ ତିନି।

ରାଜଶାହୀ ଶହରେ ଦଖଲଦାର ବାହିନୀର ଜାଲାଓ ପୋଡ଼ାଓ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯାନ ଚଲେ ୧୪ଇ ଏଥିଲି। ନତୁନ ବାଙ୍ଗଳା ବହରେ ସୁଚନା। ଏହି ଦିନଇ ହୁଏତୋ ରାଜଶାହୀର ସମସ୍ତ ବାଡ଼ୀଘର ଦାଲାନ କୋଠା ମାଟିର ସାଥେ ମିଶେ ଯେତ, ଲକ୍ଷ ମାନୁଷର ରକ୍ତେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଉଠିତୋ ପଦ୍ମା। ଟିକା ଥାନତୋ ଏଦେଶେ ତାଇ ଚେଯେଛିଲେ— ଶୁଦ୍ଧ ମାଟ୍ଟି, ମ୍ରେଫ ମିଟ୍ଟି । କିନ୍ତୁ ତେମନ ପରିକଳ୍ପନା ରାଜଶାହୀ ଶହରେ ପୁରୋପୁରି ସଫଳ କରା ଗେଲ ନା। ରୁଦ୍ଧ ଦାଢ଼ାଳୋ କାଳ ବୈଶାଖୀ । ସେଦିନେର ମେହି ପ୍ରାକ୍ତିକ ଦୂର୍ଧ୍ୱୟ ଛିଲ ସକଳେର ଜନ୍ୟ ବିଧାତାର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅସୀମ କରଣୀ ।

ଏକୁଷେ ଏଥିଲେର ମେହି ଇକବାଲ ଦିବସେର ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଆବାର ଫିରେ ଯାଇ । କବିତା ପାଠ ଆଲୋଚନା ତଥନ ପ୍ରାୟ ଶେ । ଲାଟିଞ୍ଜେର ସୋଫାଯ ବସେ ଚାମ୍ପେଲର ଡଃ ହୋସାଯେନ ମୃଦୁ ସ୍ଵରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆହମଦ ହୋସେନକେ ବଲଲେନ— ‘You are the fifth man to know it.’ ମେହି ଏକଇ ଭାଷା ! ଏକ ମୁହଁରେ ଅନୁମାନ କରା ଗେଲ, କୋନ ଘଟନାର ଉତ୍ସେଖ କରା ହେବେ ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେ ହତେଇ ସଙ୍କ୍ୟା । ଆମାଦେର ବାଡ଼ୀ ଫେରାର ତାଡ଼ା । ସଙ୍କ୍ୟା ଥେକେଇ ନାକି କାରଫିଟ୍ । କର୍ଣେଲ ଆମାଦେର ଦୂଷିତ୍ସା ଦୂର କରଲେନ । କ୍ୟାମ୍ପାସେ ଘଟା ଦୂଯେକେର ଜନ୍ୟ କାରଫିଟ୍ ଶିଥିଲ । ଆମରା ତଥନ ଏକ ଘହନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଫେଲେଛି । କବି ଇକବାଲେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥ ନିବେଦନ କରେ ସେଦିନ ଏ ଦଖଲଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କର୍ଣେଲଦେର କିଛୁଟା ବିଶ୍ଵାସ କରାତେ ପେରେଛି ଯେ ଆମରା ସାଜା ମୁସଲମାନେର ବାଚା, ସାଜା ପାକିତାନୀ ।

ଦଲବେଧେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ଜନ ବାଡ଼ୀ ମୁଖୋ ହାଟିଲେନ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏକ ଲିଫ୍ଟ ପେଲାମ ଆମି ।

বরাত অথবা জনসংযোগ ক্ষমতায় হয়ত এই প্রাণি। অবাঙালি এক ছোকরা। মেডিকাল ছাত্র। কেন সেদিন এক জীপ চালিয়ে ভাইস চাপ্সেলর ভবনে এসেছিলো, তা জানিনা। পরিচয় হতেই একটু আঠটু উর্দু বাত চিৎ- ব্যাস অমনি লিফটের আমন্ত্রণ। তখন অঙ্ককার। চারপাশে দখলদার সৈন্যের চলাফেরা। ওরা পাশ দিয়ে গেলেই সারা শরীরে শিরশির। বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। এ সময়ে কত কি ঘটতে পারে। কে কাকে ঠেকায়। কে কাকে বাঁচায়। যে কোনো মুহূর্তে জীবনের শেষ ক্ষণটি কিনা তা কি বলা যায়। কে কার খোঁজ নেয়। রাস্তায় রাস্তায় কত লাশ তো পড়ে থাকতে দেখেছি। হঠাতে আমারও যদি সেই দশা হয়, কে ফিরে তাকাবে ? কেউ না। তাছাড়া শিক্ষক কজন দ্রুত পা চালিয়ে যখন এগিয়ে গেছেন, আমি তখন ঐ ছোকরার সাথে উর্দু ফোটাচি। তাই লিফটের সুযোগ ছাড়া যায় না। আমি জীপে উঠলাম। অবাঙালি ছোকরা গাড়ী চালাতে চালাতে সেদিন বড়ই বাহাদুরি দেখালো। তার মতে আমাদের এত ভয় পাবার নাকি কোনো কারণই নেই, কারফিউ ভেঙে চলাচল কোনো ব্যাপারই নয়, সে ইচ্ছে মতো যখন খুনি গাড়ী নিয়ে ছোটাচুটি করে। সেদিন কি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সেই অবাঙালি বাহাদুর ছোকরার মুখের উপর বলতে পারতাম যে আমার পিতা নিহত এবং জননী ধর্ষিতা বলেই আমরা জীত বিচলিত। না, তা সত্ত্ব ছিল না আমার পক্ষে। তাই নীরব শ্রোতার পরীক্ষায় আমি পাশ করে গেলাম।

একক্ষে এগ্রিল সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে সবাই এক জাহাঙ্গীর বসলায়। কারো মুখে কথা নেই। সবাই যেন হঠাতে বোৰা হয়ে গেছি। শেষে কিম্বা নির্বাচনের মতো হিংস্র নরপতনের খাচায় স্বেচ্ছায় ঢুকে পড়লাম, এই অনুশোচনা কিছুতেই কেউ কাটাতে পারছি না। আমার স্ত্রী, আমার শ্যালিকা এবং আমি প্রত্যেকেই মতে মনে এমন নিবৃক্ষিতার কারণে যন্ত্রণাদন্ত। এদিকে আমাদের কান তখন খুবই সজাগভূক্তি জানি কখন দরজায় টোকা পড়ে আব কে ঢুকে পড়ে। ক্যাম্পাসের কোনো ক্ষেত্রে ফ্লাটে ‘দেশপ্রেমিক’ জওয়ানেরা যে ‘সদাচরণ’ করেছে, তাতে আব কারো আশ্চর্যে ভরসা নেই। এবার একটু যেন আত্মসম্মত হয়ে পড়ি। মনে মনে ওজন করে দেখি মানুষের কাছে কোনটি বড় - সম্মান না প্রাপ ! সম্মান না ধাকলে জীবনের অর্থ কি ? ক্রীতদাসের মতো কুকুর ফীটের মতো কোনো মতে ধূকে ধূকে প্রাপে বাঁচায় কি সার্থকতা ? আবার জীবন তো একটাই, সে যেমনই হোক। প্রাণের মায়া কার নেই ? কে বাঁচতে চায় না ? সবাই চায়। ওই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পার হয়ে চলে গেল, তারা কি শুধুই যুক্ত করার জন্য ওপারে গেল ? তাতো নয়। তারাও বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্মেই এই চলে যাবার কৌশল, বাঁচার জন্মেই তাদের যুক্ত। তবে ?

শেষ পর্যন্ত মনে মনে এক সিক্কাস্তে আসা গেল। সময় মতো ওপারে গিয়ে যখন আমরা স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হতে পারিনি, তখন এখানে এই বন্দি শিবিরে ছটফটানি নির্বর্থক নিষ্কল। এখানে আমাদের বাঁচাতে হবে, ছলে কৌশলে, চাই কি ভূত্যের মতো। কোনো উপায় নেই। টিক টিক করে সময় এগিয়ে চলে। আমরা কজন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে - কখনো চোখ লেগে আসে আমাদের, কখনো চমকে চমকে উঠি আমরা। এই বুঝি উদিঅলা কেউ দরজায় এলো, এই বুঝি কাচা মাংসের লোভে কারো জিহবা বিষাক্ত সীপের মত লকলক, এই বুঝি স্কুর্ধাত হিংস্র ফোস ফোস - ! আচ্ছা তেমন ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি ? আত্মর্যাদার জন্যে ইঞ্জিত রক্ষায় বুকে গুলি পেতে নেব, নাকি বাতিশ দাত কেলিয়ে সঙ্গের মতো হাসবো। এমন জীবনের কাছে মণ্ডু সভিয়েই তেমন ভয়ঙ্কর কিছু

নয়, ফরক সাহেব ঠিকই বলেছেন।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক শব্দে আমরা সবাই আতঙ্কে উঠলাম। ঘরবার করে কেপে উঠলো দরজা আমালা। প্রায় নভেম্বর পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাস করেছি। মর্টার' মেশিনগানের প্রচণ্ড গোলাগুলিতে ঝাঁঝরা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কত রাত, যদিও তার লক্ষ্য বস্তু কি, আমরা জানতাম না। কিন্তু একুশে এগ্রিল রাতের সেই মাটির ভিত কাঁপানো শব্দের মতো শব্দ আর কথখনো শুনিনি।

পরদিন অফিসে ধাবার পথেই রাতের প্রচণ্ড শব্দের ফলাফল দেখা গেল। কলা ভবনের সামনে শহীদ মিনার টুকরো টুকরো ইটের স্তুপে পরিণত। কয়েক মেকেণ্ড দাঢ়ালাম সেখানে। এই শহীদ মিনার কবে আবার মাথা তুলে দাঢ়াবে, এমন একটি ভাবনা মন ছুঁয়ে দেতেই বড় একটি নিঃস্বাসের পতন।

প্রশাসন ভবনে সেদিন মাত্র গুটিকয়েক কর্মকর্তা কর্মচারীর উপস্থিতি। আমার দফতরে অবশ্য সবাই ছিলেন। কাজ কিছুই নেই, শুধু স্বাভাবিকতার একটি মুখোশ রচনা। কর্মহীন কালক্ষেপন। তবুও অফিস এক বড় আকর্ষণ। সেখানে পাঁচদশটা মানুষের সাথে যোগাযোগ, সেখানেই চারদিকের খবরাখবর মুখে মুখে পাবার সম্ভাবনা। তবে একজন মানুষ যে আর একজন মানুষের সাথে খোলা মনে মনের কথা বলতাম, তা যোটেই নয়। একটু একটু করে পরম্পরার মতামত বোঝার পর মন খোলা। এইটুকু সাবধান না হবার কারণেই সম্ভবত একাত্মরের কেনো একদিন ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদের স্টেনোটাইপিস্ট শক্তি গ্রামের এমার্জেন্সি আহমদ সাহেব প্রায়ে মাশুল দিলেন। দখলদার সৈন্যরা তাকে বেঁধে নিয়ে যায়, তারপর ছয়ই নভেম্বর রাত একটায় জোহা হলের পিছনের বধ্যভূমিতে আরো বিশ জন বীর সন্তানের সাথে তাকে হত্যা করে। এমার্জেন্সি সাহেব যে বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ একীধা কে জানতো তার নিকটতম সহকর্মী ছাড়া। তিনি যে একজন প্রাতন আনন্দার এবং বিমান বাহিনীর করণিক সে কথাই বা কে জানতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাড়া! রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মৃতি সংগ্রহ শালা প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধের শহীদ' গ্রন্থ বলা হচ্ছে, স্বামীকে বাঁচাবার জন্য শহীদ এমার্জেন্সির স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাসেলর ডঃ বারী, ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদ ও মুসলিম লীগ নেতা আইনুদ্দিন সাহেবের মতো অনেকের সাহায্যপ্রাপ্তি হন। ঠিক একই কারণে অর্থাৎ মনের কথা অকপটে বলাবলির জন্যই শহীদ হয়ে গেলেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক মীর আব্দুল কাইউম। দুর্ভাগ্যজন্মে ডঃ মতিউর রহমান ও ডঃ ওয়াসিম এই দুই অবাঙালি ছিলেন তাঁর উর্ধ্বর্তন সহকর্মী।

একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরতেই শুনি পাশের এক দালানে মানুষের দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পচে গলে দুর্ধৰ্ষ ছড়াতেই আশেপাশে পথ চলতি মানুষ এই লাশ দুটির অস্তিত্ব টের পায়। তারপর অনেকে মিলে বহু কষ্টে লাশ দুটি প/১২ ডি ফ্লাট থেকে বের করে ওই দালানের সামনেই এক গাছ তলায় তাদের কবর দেয়। শোনা গেল, লাশ শনাক্ত ঃ ইউসুফ ও আফজাল, পিঅন। চৌদ্দই এগ্রিল রাতে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোশাররফ হোসেনের টুইন কোআর্টারটি দেখিয়ে দেবার জন্য ভাইস চ্যাসেলর ডঃ হোসায়েন তাদের পাঠান সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে। তারপর তারা আর ফিরে আসেনি। কেউ তাদের খোঁজ করেনি। কিন্তু বারো নম্বর দালানের এক ফ্লাটে এনে কেন তাদের গুলি

করে মারা হলো, তা বোঝা গেল না। তবে কারো কারো ধারণা, হয়ত ডঃ মোসাররফ হেসেনের বাসা দেখিয়ে দেবার পর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ওদের ফেরার পথে অন্য কোনো জওয়ানের দল ওদের ধরে নিয়ে হত্যা করে।

এই লাশ দুটি পাবার পর আমাদের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। ক্যাম্পাসের বহু দালান বহু কোয়ার্টার পাট পাট খোলা। কোথায় কি ঘটে আছে, কে বলতে পারে। আশেপাশে সব কটি ফ্লাটেই দেবার লুট হয়ে গেছে। সুতরাং সেগুলির ভিতরের দৃশ্য অনুমান করা যায়। কিন্তু কোনো ফ্লাটেই ঢোকার সাহস কারো নেই। কি জানি কোন জঞ্চালের নিচে কি পড়ে আছে। তাছাড়া চারদিকে পাকসেনারা সতর্ক দৃষ্টি ফেলে পাহারা দিচ্ছে। তারা যদি মনে করে কেউ কোনো কিছু হতাহার অধিবা চুরির উদ্দেশ্যে এইসব ফ্লাটে ঢুকেছে, তাহলে হয়ত সেই অভ্যন্তরে হাতের অস্ত্রটি ব্যবহার করে সুখ মেটাবে। তাই অন্য কোনো ফ্লাটের ভিতরে কোনো লাশ পড়ে আছে কিনা, সে খোঁজ নেওয়া কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। এদিকে এইসব ব্যাপারে বাসায় আলোচনার ফল দাঁড়ালো—ছোটো ছেলেমেয়েও দূরে যানুষের আকৃতির কিছু দেখলেই ভাবতে লাগলো ওটা বোধ হয় লাশ। একবার তো এক দূরের আমার কন্যা রীআ ঘূরতে ঘূরতে সিডি বেয়ে তিনতলায় উঠে একটি ফ্লাটে একটু উঠিং মেরে চিংকার। আমরা ছুটে বেরোতেই দেখি সে তিনতলা থেকে নেমে আসছে। ভয়ে কাঠ। কি হয়েছে কি হয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করায় সে জানালো, তিনতলায় পৰ্বনিদিরের ফ্লাটের দূরের যে ঘরটি বারদায় দাঁড়ালৈ সরাসরি ছোখে পড়ে, সেই ঘরে খাটের উপর তার হবিবুর রহমান চাচা শুয়ে আছেন। আমরা একটু দম নিলাম। অধ্যাপক হবিবুর রহমান প্রায় বেশ কিছুদিন নিষ্ঠোজ। তবে কি হাঁকে এই দালানে এনে হত্যা করা হয়েছে। তিনতলা বলে হয়ত আমরা গুরু পাছি না। তঙ্গুও ব্যাপারটি দেখা দরকার। আমার স্ত্রী ও আমি ধীরে ধীরে তিনতলায় উঠলাম, বারদায় দাঁড়িয়ে তাকালাম সেই ঘরের দিকে - হ্যাঁ একটি মানুষের মতো কি যেন খাটের এ পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। আর একটু ভালো করে দেখার জন্য এগোতেই সব পরিষ্কার - চোখের ভুল আর কি। একটি পিতলের হাড়ি - মাথার সাইজ প্রায় - কাত হয়ে থাটে, তার অর্ধাংশ কাপড়ে ঢাকা। সব কটি ঘরই যথারীতি লঙ্ঘণ্ণ।

কিন্তু আমাদের আতঙ্কের অবসান কি এতই সহজ। রাত হলেই সবাই একঘরে গুটিশুটি একত্র। কখনো চোখ একটু লাগে কি লাগে না, চমকে চমকে উঠি। কানের শ্বর্ণ কাতরতা দারুণ। বাইরের দরজায় এই বুঝি কেউ এলো, এখনই হেকে উঠবে ‘দরওয়াজা খোলো’। তারপর ? ।

কহেকদিনের মধ্যে একতলার প্রতিবেশী সহকারী গ্রন্থাগারিক মুহূর্মদ তাহা ফিরে এলেন। আমাদের সে কি আনন্দ। এতদিন পর একজন দুঃখের সাথী পাওয়া গেল। ভয়ে আমরা তখন আধমরা। তাহা ভাই ফেরাতে একটু ভরসা পেলাম। বহুসে তিনি আমার অনেক বড়, তাই বিশেষ করে আমারই ঘেন স্বত্ত্ব। তাকে আর পথক থাকতে দেওয়া হলো না। আমাদের ফ্লাটে উঠলেন তিনি, আমাদেরই পরিবারভূক্ত। তাহা ভাইয়ের মুখে শোনা গেল গ্রামের তৎকালীন হালচাল। সেখানেও পাকসেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। গ্রামের আশেপাশে বিশেষ বিশেষ স্থানে অথবা সীমান্ত বরাবর তারা পঞ্জিশন নিচ্ছে। অতএব গ্রাম আর নিরাপদ নয়। গ্রাম ছেড়ে আমাদের আগেভাগে চলে আসা অবশ্যই বড় রকমের

বোকামী ও হঠকারিতা ছিল, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে আমাদের গ্রাম ছাড়তেই হতো। এমন কি সেই সাহসী অধ্যাপক খালিদ হাসানও সীমান্ত পার হয়ে চলে গেছেন। একরাত তাহা ভাইয়ের গ্রামে ছিলেন তিনি। লড়াই চলবে, সহজে মিছে না, এখানে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় - এইটুকু বুঝেই তিনি চলে গেছেন। ক্যাম্পাসে আমাদের ফেরা ঠিক হয়নি এ নিয়েও তাঁর খেদ প্রকাশ করে গেছেন খালিদ হাসান। তাতে হাড়ে হাড়ে টের পাঞ্চি। খালিদ হাসানকে সত্তিই হিংসে হয়। বাহু কেমন সময় মতো চলে গেলেন। ভাগ্যবান বটে। তাহা ভাইয়ের ধারণা, ক্যাম্পাসই হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কিন্তু ক্যাম্পাস কোথায়। চারদিকে যে পায়তারা, তাতে এই শুনাটিকে বন্দীশিবির কিংবা বধ্যভূমি বললেও কি অতুল্পী হয়? আর নিরাপত্তার কথা - সে তো একের পর এক ঘটনার আবর্তে পাক খেতে খেতে বুঝেই চলেছি কেমন আছি।

এক একটি সকাল এক একটি দৃঃসংবাদ এনে দেয়। মে মাসের প্রথম দিকে কোনো এক বুধবারে প্রায় দুপুর নাগাদ অফিসে এলেন একজন রক্তাঙ্ক মানুষ। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সোলায়মান আলী সরকার। সারা দেহ তাঁর কাটা ছেঁড়া ক্ষত বিস্তৃত। ঘটনার দিবরণে বোঝা গেল এভাবে আহত না হয়ে তাঁর বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। রাজশাহী আসার উদ্দেশ্যে গ্রামের শ্টেশন থেকে তিনি ট্রেনে উঠেই দেখেন কামরা ভর্তি হিস্পু পাক জওয়ানের দল। দু একজন বাঙালি যাত্রীও ছিল সেখানে। তাদের সাথে প্রথমে নিষ্ঠুর ব্যক্তি বিদ্রূপ শুরু করলো ওই জওয়ানেরা। ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সোলায়মান সাহেব সব দেখছেন—তাঁর দুহাতে ধরা তাঁর সাইকেল। স্যুস্টেডিপ করতে করতে এক পর্যায়ে ওই পাকসেনারা যখন দুর্ভিজন বাঙালিকে ঝুঁটিয়ে মারতে উদ্যত হলো, সোলায়মান সাহেব বুবলেন, আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালে নির্ঘাঁ মৃত্যু। তাই জওয়ানেরা তাঁকে ধাওয়া করতেই তিনি সাইকেলে বগলে চলাটু ট্রেন থেকে লাফ দেন। তারকাটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে আহত হয়ে কোনো মতে জ্বালে বাঁচলেন সোলায়মান সাহেব।

ইতিমধ্যে উনিশ বছর কেটে গেল। সোলায়মান সাহেবের সেই রক্তাঙ্ক দেহ হয়ত আজ শুকিয়ে গেছে। তাঁর সেই কাটা ছেঁড়া মুখটি আর দেখতে পাঞ্চ মা আমরা কেউ, এমনকি তাঁর আত্মজনের কাছেও তাঁর সেই রক্তাঙ্ক মুখটি অদৃশ্য।

মে মাসের ঠিক মাঝামাঝি বাগলা বিভাগের অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে গেল দখলদার সেনাবাহিনী। এ খবরে সবাই আতঙ্কে উঠলায় আমরা।

হেনা, হেনা কি অপরাধ করলেন?

কে -ই বা কী অপরাধ করলেন?

তাও তো বটে।

আলোচনা থেমে দায়। সকলের একটাই অপরাধ, আমরা সবাই বাঙালি। কিন্তু সে কথার স্পষ্ট উচ্চারণে দারুণ ঝুঁকি। কাউকে বিশ্বাস নেই। কে কখন কার কথা কাকে কিভাবে বলে দেয় আর তাতে কী ফল ভোগ কে জানে। সকলের মুখে তাই ছিপি। মনের কপাট বৰ্জ।

পঁয়ষষ্টি সালে পাকিস্তান-ভারত মুদ্রের সময়ে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের রচনা ও পরিচালনা করে হেনা সাহেব একটি পাকিস্তানী খেতাব পান। ওই দুর্দিনে সেটাই হয়ত রক্ষা কবচ হতে পারে, এমন এক ক্ষীণ আশা আমাদের মনে এলো। অনুমান একেবারে যথেষ্ট ছিল না। একদিন পরই হেনা সাহেব মৃত্যি পেলেন। তবে

কি তাকে দিয়ে আবারও মিথ্যা ভাষ্য তৈরী করানো হবে ! কেন তাকে এমন করে একদিনের জন্য আটক করা হলো, কেনই বা তিনি ছাড়া পেলেন সবটাই অস্পষ্ট। মুক্তিলাভের পর হেন সাহেবে আর মুখ খুলেন না। কোনো কথা বলা কত বিপজ্জনক সে কে না জানে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের পরও তিনি মুখ খোলেন নি। ওই সময়ে আমার বাসায় তাঁর আড়া ছিল নিয়মিত। কথায় আর গানে ভরাট সেই সময়। কিন্তু কখনোই তাঁর মুখ ফসকে আসেনি, পাক সেনাদের আচরণ কেমন ছিল অথবা কেন তিনি ওদের ‘নেক নজরে’ পড়েন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি আটক হলেন দালালীর অভিযোগে। জেল হাজরত এবং হাসপাতালে কাটলো তাঁর কলিন। দালালীর তেমন কোনো প্রমাণ নেই। অতএব অব্যহতি পেলেন তিনি। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ একটি দুরারোগ্য ক্ষত রেখে গেল তাঁর মনে।

পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ যে পাকসেনাদের তালিকায় আছেন, তা ছিল আমাদের নিশ্চিত অনুমান। কেমন করে এতটা ধারণা, তারও কারণ বলা যায়।

আমার সহকর্মী ডেপুটি বেজিস্টার সৈয়দ ইবনে আহমদ ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকসেনাবাহিনীর যোগাযোগের সূত্র, লিয়াঙ্গো অফিসার। প্রথম প্রথম এই যোগাযোগ তিনি রক্ষা করতেন অতি উৎসাহে স্বতঃকৃতভাবে। পরবর্তীকালে সম্ভবত লিখিতভাবেই এই দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। ভদ্রলোক কলকাতা-ইসলামিয়া কলেজে এক সময়ে পড়তেন এবং তখন সেখানে মুসলিম লীগের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ভালোভাবেই যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে মুসলিম লীগ মহলে তাঁর বিশ্ব প্রভাবও ছিল। সৈয়দ ইবনে আহমদ সাহেবের প্রগাঢ় সিপাহীগুলি সম্পর্কে আমরূপ্তেখন সবাই অবিহিত। একান্তের পঁচিশে মার্চের পর তিনি বিশ্ব উল্লিঙ্গিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কর্মতংপরতা পোশাকের চেকনাই এবং চেহারার রোশনাই ক্রমেই বাড়তে থাকে। এপ্রিলের প্রথমে তিনি একটু মুষড়ে পড়লেও মধ্য এপ্রিলে পাকসেনাবাহিনীর রাজশাহী বিজয় অভিযানের পর তাঁর শূরুতি ও খোশ মেজাজ একেবারে ঢচ্চড় তুঙ্গে উঠে গেল। তখন আড়ালে কেউ কেউ ঠাণ্ডা করে তাঁকে ‘সিতারা-ই-পাঁয়তারা’ খেতাবে ভূষিত করতো। আচরণে সজ্জন হলেও ভদ্রলোক তাঁর সর্পিল মনকে সবসময়ে গোপন রাখতে পারতেন না। তিনি বাঙালি না বিহারী এ নিয়ে নানা তর্ক ছিল। তবে ওই একান্তরে তাঁর ঠোটে একটি বাক্য প্রায় প্রত্যোক্তি নিঃশ্বাসের সাথেই নিঃস্ত হতো : ‘বাঙালি গাদ্দার হায়।’ কেমন করে বাঙালি গাদ্দার হয়ে গেল, তার বিশ্ব বর্ণনা দিয়ে তিনি চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করতেন। ইবনে আহমদ সাহেবের এই খেলামেলা কথাবার্তাই ছিল আমাদের জন্যে সুবিধাজনক। তাঁর চোখমুখের উজ্জ্বলতার কমবেশী দেখেই আমরা বুঝতে পারতাম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকসেনাদের অবশ্য ভালো কি মন। অতএব আমি ক্যাম্পাসে ফেরার পর বারবার তিনি যদি আমার কাছে জানতে চান, ‘খালিদ হাসান কোথায়, কাজী সালেহ আহমদ কোথায়, কোন গ্রামে ওরা যেতে পারেন’ ইত্যাদি, তাহলে কি আর কারো বুঝতে বাকি থাকে যে ওই দুজনের উপরেই সামরিক কর্তৃপক্ষের বিশেষ নেকনজর।

মধ্য মে সন্ধ্যাবেলো তাহা ভাই জানালেন, কাজী সালেহ আহমদ সাহেব ক্যাম্পাসে ফিরেছেন। বিকেলে কোথায় নাকি তাঁকে দেখা গেছে। দুচিন্তার ব্যব বৈকি। ইবনে

আহমদ সাহেবের কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, সালেহ সাহেব কতটা চিহ্নিত। তাহা ভাই শ্বিং করলেন, পরদিনই আমাদের এই আশঙ্কার কথা তাকে জানাতে হবে। অবশ্যই সালেহ সাহেবের চলে যাওয়া উচিত, নইলে মহাবিপদ অনিবার্য। অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তিবিধানের মাত্রা অনুসারে চার ভাগে সাজানো দৃঢ়ত্বকারী বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের যে তালিকা ভাইস চাম্পেলের কর্তৃক প্রণীত হয় এবং যে তালিকা স্বাধীনতার পরপরই ফাঁস হয়ে যায়, সেখানেও প্রথম ক্যাটগরিতে ছিলেন ডঃ কাজী সালেহ আহমদ।

আমাদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তক্ষণি বোঝা গেল। হঠাৎ একটি জীপের শব্দে তাহা ভাই এবং আমি চমকে উঠলাম। জীপের শব্দ যেদিকে সেই পাশের এক জানালার পাশে চেয়ারে দাঁড়িয়ে জানালার উপরিভাগের কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলাম, ইবনে আহমদ সাহেবের বাসায় দুর্নিষ্জন সামরিক কর্মকর্তার আগমন ঘটেছে। দালানের সামনেও একজন জওয়ান শশস্ত্র পাহারায়। তখন সঙ্গে পেরিয়ে গেছে। চারাদিকে অঙ্ককার। আমরাও ঘরের আলো জ্বালাইনি। অঙ্ককার ঘর থেকে পাশের দালানের একতলায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখারও বড় সুবিধা। ইবনে আহমদ সাহেবের বরাবরই অতিথি পরাম্পরণ। মানুষকে আদর আপ্যায়নের শরাফতি প্রায় তাঁর সহজাত। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যক্তিগত ছিল না। বেশ কিছু টুকরো টুকরো উর্দু লক্ষজ, হাসি, চাহের কাপ পিরিচ চামচের টুংটাঁ। ট্রের উপরে সাজানো কয়েকটি গ্লাস ও জগ আলোর নীচে ঝকঝকে। তারপর চা পান শেষে সামরিক কর্মকর্তারা বাইরে এলেন। ইবনে আহমদ স্মৃত্বে তাঁদের বিদায় দেবার আগে দিকনির্দেশ করলেন পশ্চিমে। কর্মকর্তা ও জওয়ানের খুব সম্পর্ণে নিঃশব্দে হেঁটে হেঁটে পশ্চিম দিকে ঝৌপ জঙ্গলের দিকে চললেন। সেজনকে কোনো পথ ছিল না, একটি শুকনো দ্রেন। তাহা ভাই বললেন, ওই দ্রেন পেরিয়ে যে দালান, সেখানেই নাকি সালেহ আহমদ সাহেবের উঠেছেন। অতএব কাকে ধৰাবুঝি তোড়েজোড় এত সতর্কতা, তা বোঝার আর বাকি কোথায়। পরদিন সকালেই মুক্তি মুখে খবর, কাজী সালেহ আহমদ সাহেবে আটক। চার মাস এক বন্দীশিল্পের নির্দারিত নিঃগ্রহীত হন এই অধ্যাপক। তাঁর এমন কি অপরাধ ছিল? সেভিয়েত দেশে তাঁর উচ্চশিক্ষা, তাই কি তিনি সন্দেহভাজন। অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কোনো পর্যায়ে কোনো কারণে ঠাঁদা সংগ্রহে বেরিয়ে তিনি কি ইবনে আহমদ সাহেবের মতো কোনো কর্মকর্তার বিরাগভাজন হন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের ঘণ্টে সৈয়দ ইবনে আহমদ সাহেবকে তখন আমরা মনে মনে দারুণ ভয় করেছি। তাঁর হাসি ঠাঁট্টা মশকরা, এমনকি যে কোনো সাধারণ কথারও গুরুত্ব অথবা গৃহ তৎপর্য ছিল। একদিন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক তাবেই তিনি জানতে চাইলেন বদরুন্নেগীন উমর সাহেবের ভাষ্য আন্দোলনের বইটি আমার কাছে আছে কিনা। উনি পড়বেন। উমর সাহেব তাঁর বর্ধমানের মানুহ, উপরন্তু উমর সাহেবের বাবা এক সময়ে তাঁর লীডার ছিলেন, অতএব বইটির সম্পর্কে তাঁর বাড়তি আগ্রহের কথাও তিনি জানালেন। কিন্তু আমি বেমালুম মিথ্যে বললাম- ‘নেই’। শুধু মিথ্যে বলাই নয়। সেদিন বাসায় ফিরে তাবৎ রাজনৈতিক বই আগুনে পুড়িয়ে সেই মিথ্যেকে বিশুল্দ করা হলো সত্যে। এমনকি আমার বাবাকে ও আমাকে দেওয়া উমর সাহেবের স্বাক্ষরিত বইগুলিও রক্ষা পেল না। কাউকে বিশ্বাস নেই। কি জানি কোন অস্তুহাতে কি করে বসে পাকিস্তানী দখলদার সেনা। ওদের চোখ তো চারপাশে। তাই একটি কাগজে উর্দ্ধতে আমার নাম লিখে ফ্লাটে ঢোকার

দরজায় খুলিয়ে দিলাম, যদি এভাবেও উৎপাত এড়ানো যায়।

সেই প্রিল মের এক একটি সকাল আসে আমরা মনে মনে ভাবি এবার বোধ হয় একটু স্থিতি, এবার সব দুষ্টিগার অবসান। কিন্তু কই? উদ্বেগ ঘাড়ে আরো চেপে বসে। এক একটি ঘটনায় আমরা দিশেহারা। তাহা ভাই ও আমি সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে দুজনে একসাথে নিয়ামিত অফিসে যাই। পথে বেরিয়ে বাসার আশেপাশে অথবা জুবেরী ভবনের সামনে অস্ত্র ফিট করে পাহারারত কোনো সেপাইকে দেখলেই আমরা দাঁত কপাটি মেলে আস্মালামো আলায়কুম, আপ খায়েরিয়াৎ ইত্যাদি বলে মাথা নিচু করে হাঁটি। তখন আমাদের শরীরের রক্ত চলাচল যেন এলোমেলো হয়ে যাই। বাঁ দিকে মনুজ্ঞান হলের দক্ষিণে মাঠের মাঝে সারি সারি ভারী কামান সাজানো। জওয়ানেরা সেই কামানগুলি প্রতিদিন সকালে যে রকম ধীরে ধীরে আলতোভাবে মোছামুছি করতো, তা অনেকেরই চেষ্টে পড়তো। মনে আছে একবার এ ব্যাপারে কে একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ভাইস চাম্পেলর ডঃ বারী রসিকতা করে তাকে বলেছিলেন - ‘সত্যিই আমাদের শরীরও বোধহয় এমন আদর আমাদের কাছে পান না।’ ডানে বামে এই সারি সারি কামান বন্দুক রাইফেলের নলের মুখে প্রতিদিন সকালে হৈটে যাওয়া কেমন লাগতো? সারা শরীরে একধরনের শিরশি঱ানি, রক্ত চলাচল - কোন নালী থেকে কোন নালীতে রক্ত ছলাই করে পড়ছে তা যেন স্পষ্ট অনুভব করতাম। এক একবার পিঠের কোনো বিন্দু কিংবা কোমরের কোনো পাশ সম্পর্কে অতি সচেতন হয়ে উঠতাম। মনুছতো, এই বুঝি একটি বুলেট ওই বিশেষ স্থানটি ভেদ করে গেল। একদিন সশস্ত্র জওয়ানেরা ওই সময়ে ডাকতেই পা দুটি আড়ে। ‘এই সুনো’- ওদের গলায় ঝাঁঝ ছিল তবুও ওদের ডাক। ভয়ে ভয়ে ওদের কাছে গেলাম। ‘ফরমাইয়ে’-আমাদের বক্সে পাটি আকর্ণ বিস্তৃত। ওরা সবাই দেখলাম গাছের লিচু পেড়ে নাড়ানাড়ি করছে, যিনি কুরবে যেন বুঝতে পারছে না। একটি লিচু আমার হাতে দিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো ‘ইয়ে কিস তরা খ্যাল যাতা?’

আচর্য! লিচু যাওয়াও জানে না। আমি লিচুর খোসা ছাড়িয়ে দেখালাম, কোনটা খেতে হচ্ছে, কোনটা ফেলে দিতে হচ্ছে। ওরা খুব খুশী।

‘বহু আচ্ছা। শুকরিয়া। লে লো, লে লো।’ ওরা আমাকে দুটি লিচু দিল। লিচু নয় বেহেঙ্গতী মেওয়া যেন আমার হাতে এসে পড়লো। প্রভুদের কৃপায় আমি ডগমগ। ওরা আমাকে মারলো না। আচর্য! কি দয়ালু ওরা। ঠিক এমনি এক অভিজ্ঞতা আর একবার হচ্ছে ওই সময়। সিগারেট দুর্ভাগ্য। প্রতিটি প্রশ্বাসে ধূমপান না হলে চলে না, অথচ সারাদিন ছটফট করছি, একটি কাঠি জোটেনি। কি করি? রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জিল্লার রাহিম বলতেন, নেশা যখন চাপে তখন পাটখড়ি মুখে ধরিয়েও টানতে ইচ্ছে করে। এমন অবস্থায় এক বিকেলে বাসার কাছেই ইটাইটি করছি আর পরিচিত কাউকে পেলেই কোথাও সিগারেট পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করছি। হঠাতে কানে এলো এক মিটি আওয়াজ- ‘সিগারেট পিয়েগো?’ তাকিয়ে দেখি পশ্চিম পাড়ার বাবো নমুব দালানের পাশের টিউবওয়েল থেকে স্নান সেবে কাপড় পরছে এক জওয়ান। একটু আগে কারো কারো কাছে আমি যে সিগারেটের খোঁজ করছিলাম, হয়ত সে শনেছে। তাই এই আমন্ত্রণ : ‘সিগারেট পিয়েগো?’ আহ, কি মধুর সেই ডাক। আমি কাছে যেতেই প্যাকেট এগিয়ে দিল। অতি সম্পর্কে একটি সিগারেট তুলে নিয়ে আমি বিগলিত হয়ে বললাম- ‘শুকরিয়া।’ ওই

জওয়ানের আচরণ ততটা কুঢ় নয়। একটি সিগারেট নিজে ধরিয়ে পূরো প্যাকেট আমাকে দিয়ে সহজ ভাবেই সে বললো—

‘লে লো।’

‘আপকা কেয়া হোগা?’ আমি দ্বিধাবিত।

‘হ্ম কো মিল জায়েগা। তুম লে লো।’

সে কি আনন্দ আমার! সুরমা সিগারেট এক প্যাকেট। তাও আবার আমাদের দণ্ডমুণ্ডের প্রভূদের দান। যেন সাত রাজ্ঞার ধন মানিক পেলাম, এমন বুক ফুলিয়ে বাসাই ফিরে এক ঘটায় পূরো প্যাকেট ফুকে দিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পঁচিশে মার্চ এবং চৌদ্দই ডিসেম্বর এই দুই দিনেই বিশেষ করে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তেখন কোনো বিশেষ দিন নেই। পঁচিশে মার্চ রাতের প্রথম শহীদ গর্ড আবুর রাজ্ঞাক। কিন্তু তারপর প্রায় দীর্ঘ নমাস এই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শতশত মানুষ পাকিস্তানী জঙ্গাদের হাতে নিহত হয়েছে। এই শতশত মানুষের মধ্যে কিছু ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী, বাকি সবাই বহিরাগত। দিনের পর দিন মাসের পর মাস হাত বৈধে চোখ বৈধে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ধরে এনে শহীদ জোহু হলের পূর্ব পাশে বিশ্রীণ জয়িতে তাদের চিরদিনের মতো শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। শহীদ জোহু হল তখন পদাতিক বাহিনীর সদর দফতর এবং তার পাশের খোলা প্রান্তির বধ্যভূমি। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব-শেষ সীমানায় হটিকালচার ফার্মের উত্তর দ্বিতীয় পর্যন্ত বিস্তৃত এই গণ কবর। বাহাতুর প্রাণের প্রথমার্থে এই সব এলাকায় বহু গণ কবর আবিষ্কৃত হয়। শেষে এক পর্যায়ে এমনও মনে হলো, এত খোড়াখুড়ি করে নতুন কিছু জানার নেই। সারা দেশটাই যেখানে গণকবর, সেখানে এই স্থানটির এমন কি বেশিটা! ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণকবর’ শিরোনামে একটি ছবি বিভিন্ন গৃহে বহু মুদ্রিত। এই ছবিতে দেখা যাচে সাত্ত্বসারি কক্ষাল করোটি, যেন মানুষের একটি মিছিল আ-স্কন্দ মাটিতে পেঁতা, তবুও সেই মানুষের মাথা উচিয়ে দাঢ়াতে চায় এবং তাদের অতল গর্ড চোখের কেটারে অক্কারে উষ্টাসিত সেই কথা—‘আমাদের বর্তমান তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্জন করে গেলাম।’ এই ছবিটি তোলেন আলোকচিত্রী আবুর রাজ্ঞাক। পাশের গ্রাম মোহনপুরে মানুষেরা বলেন, একাস্তের সালের পাঁচাই ও ছয়ই মে দলে দলে মানুষকে অবাই করে ওই হটিকালচার ফার্মের পিছনে পুতে ফেলা হয়। বাহাতুর সালের তেইশে এপ্রিল এই গণকবর আবিষ্কৃত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কশাই খানায় এই যে বিপুল মানুষের জবাই মাসের পর মাস অব্যাহত, এ বিষয়ে আমরা যে কিছুই টের পেতাম না, তা কিন্তু নয়। যেমন এপ্রিল-শেষে একদিন অফিসে গিয়েই কথাটি কানে এলো যে পিঅন ওয়াহাব আলী, প্রহরী কোরবান আলী ও অর্ডারলী মতিউর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহায়তায় পাকিস্তানী জঙ্গাদের ধরে নিয়ে গেছে। প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তার বোধ হয় আশঙ্কা ছিল, কী হতে যাচ্ছে। তাই তৎকালীন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসার এখলাসউদ্দিন আহমদ সাহেব মনোবিজ্ঞান বিভাগের অর্ডারলী মতিউর রহমানকে দেখেই বলেছিলেন, ‘পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, এখানে থাকিস না।’ কিন্তু ওরা তিনজন কেউ সেই শীবধান বাক্য কানে তোলেনি, পালিয়ে যায়নি। ওরা সরল বিশ্বাসে রেজিস্ট্রারের তলবে সাড়া দেয়। ওয়াহাব

আলী ও কোরবান আলীকে শহীদ হোଇ হলে নিয়ে হত পা বেথে হত্যা করা হয়। বরাত
জোরে বেঁচে যায় অর্ডারলী মিডিউর রহমান। উর্দু একটু আখন্দু তার আয়তে ছিল এবং
অবাঙালি অধ্যাপক জামিল সাহেবের সেবা করায় তার পুণ্য সংক্ষয় ছিল অগাধ। তাই তাকে
বলা হলো : 'ভাগ যাও, এখার কভি মৎ আনা।' মিডিউর রহমান ভাগলো রাজশাহী ছেড়ে।
দেশ শক্তমুক্ত হবার আগে আর এমুখে হয়নি সে।

মে মাসের বারো তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে সে কি চাক্ষল্য ! খুব চাপা
গুঞ্জনে ও উত্তেজনায় মূখ্য মূখ্য খবরটি ছড়ালো। গশিত বিভাগের এক অধ্যাপক, নাম
মুজিবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একটি প্রতিবাদ লিপি দিয়েছেন, ভয়ঙ্কর সেই
পত্র যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে সেনানিবাসে পরিণত করায় প্রতিবাদ লিখিত এবং বর্তমান
কাল গহণ্ত্যা ও স্থায়ীনতা মুক্তের সময়কাল বলে বর্ণিত। একাত্তর সালের উন্নিশে এপ্রিল
তারিখের সেই চিঠিটে কী লেখা ছিল, একবার দেখি :

This is to inform the authorities that I am going to leave the campus
since the university campus has, at the moment, been degraded to the state
of a military camp. I may come to the campus when the university regains
its status and sanctity and starts functioning as a university in true sense and
when

I hope to be kept informed about situation here in the address noted
below, where I hope to spend these days of calamity, genocide and freedom
movement.

Please note the change of my name and from now this name should be
used in future communications.

Sd/Devaradas

previous name : Mujibur Rahman

Vill : Maharul Senior Lecturer

PO : Bogra Parbatipur Mathematics

Bogra

(সৌজন্য The Wave: 29.4.72)

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। তথ্যকষ্টিত মুসলমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কৌর্তিকলাপে
বিক্রূ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান যে তার মুসলমান পরিচয় ঘৃণাভাবে পরিত্যাগ করে হিন্দু
নাম দেবদাস গ্রহণ করেছেন, তাই শুধু নয়। এমন একখানি প্রতিবাদ পত্র প্রশাসনের কাছে
পাঠিয়েও সেই অধ্যাপক দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পাসে এক কোআর্টারে অবস্থান করছেন।
মানুষটি অবশ্যই পাগল হয়ে গেছেন। চারদিকে হত্যা ধর্ষণ লুঠন নির্যাতনে তাঁর সুস্থিতা
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সেটাই খাত্বিক। যে কোনো সুস্থি আত্মর্থনা ও মানবিকবোধ সম্পর্ক
মানুষই এমন পরাহতিতে উঘাদ হবে। কিন্তু আমাদের মতো পনেরো আনা মানুষের
চরিত্রে তো নানা ঘাটতি। জীবন মতু পায়ের ভৃত্য বলে প্রাণ বিহঙ্গতি শক্তির ধ্বনির ধ্বনির
ছুড়ে ফেলা বড়ই কঠিন। আর তাই বহু অন্যায়ের আমরা নীরব দর্দিক মাত্র, সরব
প্রতিবাদী নই।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারকে লেখা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদ পত্র কেমন করে সামরিক দফতরে ভৱিত গোছে গেল? যেখানে নিরাহ মানুষকে নির্বিচারে জবাই করা হচ্ছে, সেখানে একজন প্রতিবাদী বুজুজীবীর এই পত্র তাঁর জন্য কি ভয়াবহু পরিণাম রচনা করবে, তা কি অনুমান দ্রুতসাধ্য? এই চিঠিকে পাগলের প্রলাপ বলে চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় নথিপত্র স্থূপে কবরস্থ করা কি এমনই কঠিন?

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তখন ক্যাম্পাসের পূর্ব পাড়ায় ছিলেন, তাঁরই সহকর্মী অধ্যাপক সুব্রত মজুমদারের পরিত্যক্ত ফ্লাটে। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদ সেই বাসগৃহ চিনিয়ে দেবার জন্য এক সামরিক ক্যাট্টেনের সঙ্গে গেলেন এবং বিশ পর্টিলি মিনিটের মধ্যে সেই অসম সাহসী অধিবা বন্দু উদ্বাদ অধ্যাপককে গাড়ীতে চড়িয়ে ফিরে এলেন। ইবনে আহমদ সাহেবকে নামিয়ে দেবার জন্য প্রশাসন ভবনে গাড়ীটি দাঢ়ালো কিছুক্ষণ। গেটের পাশেই আমার দফতর। প্রায় দৌড়ে বেরোলাম আমি সেই অধ্যাপককে এক নজর দেখার উদ্দেশ্যে যিনি সজ্ঞানে অধিবা অচেতন অবস্থায় আমাদের মনের জ্বালাটি প্রকাশ করেছেন। ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় ছিল না। তাই সেই মুহূর্তের একমাত্র ভাবনা, হয়ত এমন একটি সত্ত্বিকারের মানুষকে কোনোদিন আর দেখতে পাবো না। গাড়ীতে ক্যাট্টেনের পাশে তখন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান নির্বিকার ভাবলেশহীন। চোখে মুখে তাঁর কোনো ভয় দৃশ্যমান আন্দোলন নেই। একটু পরেই যে তাঁর প্রাণটি কঁটামারা বুটের তলায় নিপিট হবে, তাও যেন তাঁর ভাবনায় নেই। অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে দেখে বারবার আমার মনে পড়তে লাগলো সব্যসাচীর উদ্দেশ্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সেই শুভ্রার্থঃ ‘তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছো’

ইবনে আহমদ সাহেব গাড়ী থেকে নামলেন। খন্থারীতি সালাম বিনিময়। তারপর গাড়ী ইকিয়ে চলে গেলেন ক্যাট্টেন। চোখে মুখ্য তাঁর আনন্দ উপরে পড়ছে। কত বড় খোশ নসীব, একটি জ্যাপ্ত বাঘ জালে পুরেছেন। শিকারী ও বাঘের সংলাপ এবং অন্যান্য বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে আহমদ সাহেবের কথার ফাঁকে ফাঁকে পাওয়া গেল ধীরে ধীরে। অনেকে বলতেন, ইবনে আহমদ সাহেব দারুণ ধূর্ত। আমার কথনো তা মনে হয়নি। বরং তিনি একটু খোলামেলা মনের মানুষই ছিলেন। মনের আবেগ উচ্ছাস স্ফূর্তি দুর্ঘ বেদনা যিনি গোপন রাখতে অপারগ, তিনি আবার কেমন ধূর্ত?

অক্তৃত্বার অধ্যাপক মুজিবুর রহমান একাই ছিলেন শূন্য ফ্লাটে। ক্যাট্টেন প্রশ্ন করলেন :

‘What is your name?’

‘Devadasi’ নির্বিকার উত্তর। অধ্যাপকের প্রতিবাদ পত্রেও এই নাম পরিবর্তনের কথা বলা আছে। পত্রের প্রসঙ্গক্রমে ক্যাট্টেনের আবার প্রশ্ন :

‘What do you mean by genocide?’

অধ্যাপকের সাফ জবাব : ‘That which you are committing these days’

ক্যাট্টেনের মুখের উপর ঠাস করে এমন কথা কেউ তখন ছুড়তে পারে কল্পনারও অতীত। তাই ক্যাট্টেন ভৱিত সিদ্ধান্ত নেন :

‘Come with me.’

'Let me have my lunch first! I am now cooking.'

অনুরোধ জানালেন অধ্যাপক রহমান। কেননা একমুঠো চাল তখন ফুটিয়ে নিছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যাস্টেন তাঁকে সেই সময় দিতে নারাজ :

'Oh don't bother. I will give you a better lunch.'

সেই বেটার লাষ্ট কেমন, ইবনে আহমদ সাহেব চোখের ইংগিতে আমাকে বুকিয়ে দিলেন। রাজশাহী, পাবনা ও নাটোর কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রায় চার মাস ধরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সেই 'বেটার লাষ্ট' খেয়ে খেয়ে অবশেষে বক্ষ উদ্ঘাদ হয়ে পাঁচই সেটেশ্বর মুক্তি পেলেন অধ্যাপক রহমান। মুক্তির পর জয়পুর হাটে চলে যান তিনি।

তারপর দেশ স্থানীন হলো। ক্যাম্পাসে ফিরলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ওরফে দেবদাস। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু অধ্যাপক রহমান আর কোনোদিন তাঁর সেই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেলেন না। পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর 'সদাচরণে' তিনি আজ চির উদ্ঘাদ। অনেক টাকা ছিল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হ্যাবিট (অগ্রণী) ব্যাংকে। কিন্তু সে টাকার মালিক তো মুজিবুর রহমান—দেবদাস নয়। স্থানীনতার পর দু এক বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জুবেরী হাউসে অবস্থানের সুযোগ পান। তারপর একদিন কৌশলে তাঁকে উৎপট্টি করে পাঠানো হলো হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালে। সেখানে তাঁর চিকিৎসার কোনো পরিকল্পনাই কারো ছিল না। তাই দুদিন পরই তাঁকে পথে নামতে হলো। তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক তাঁর জন্য চিরদিনের মতো বক্ষ হয়ে গেছে। জুবেরী ভবনে সুস্থ ভৱসনের পৃষ্ঠাপাশি এমন একজন ব্যতিক্রমী মানুষের কি শুন হতে পারে! পাকিস্তানী জল্লাদের হাতে শহীদ হয়ে গেলে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে না হয় প্রতি বছর পুল্মালয় অর্পণ করা যেতো এবং তাঁর প্রতিপাল্যের ভরণ পোষণ বাসস্থান ইন্টার্নেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিশ্চিত হতো, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি জীবন্ত শহীদ। তাঁর আজো তিনি পথে পথে ঘুরছেন। বাঙলাদেশের মাটিতে ঠিকানাবিহীন। একাত্তরে ত্রিশ লক্ষ শহীদের হিশাবই কেবল আমরা জানি, জীবন্ত শহীদের কোনো পরিসংখ্যান আমাদের নেই।

আরো কোনো কোনো শিক্ষক জল্লাদের নজরে পড়ে যান। কেউ কেউ ভারত ফেরত হ্যার কারণে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধা স্বজন সুবাদে। ফলিতপদাৰ্থ বিভাগের অধ্যাপক এম. এ. রকীব একসময়ে বিমান বাহিনীর এভুকেশন কোরে ছিলেন। সুতৰাং ভারত থেকে ফেরা যাত্রই তিনি আটক এবং নয় দিন পাকিস্তানী অতিথি গ্রহণের পর তাঁর মুক্তি। রকীব সাহেবের প্রাণটি রক্ষা পাবার পর একদিন তাঁর সাথে পথে দেখা। সুস্থান্ত্রের অধিকারী এই মানুষটির চেহারায় তখন পাকিস্তানী অতিথিরে আতিশয় অতিশয় স্পষ্ট। 'কেমন আছেন' এমন কুশল বিনিয়নও তখন অবাঞ্ছৰ। তাঁকে দেখে আমি নির্বাক। বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক আঙ্গুল খালেকও একসময়ে ফিরেছেন ক্যাম্পাসে। কিন্তু বেশী দিন এখানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাঁর অগ্রজ প্রফেসর মহহারুল ইসলাম স্বাধীনতা মুক্তের একজন নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি। সুতৰাং খালেক সাহেবকে নিয়ে পাকসামরিক কর্মকর্তাদের টানাটানি খুবই স্বাভাবিক। নইলে এমন অনেক শিক্ষকও ছিলেন যারা ওপারে কিছুদিন কাটিয়ে এলেও কেউ সে খবর পায়নি।

আবার আমাদের দৈনন্দিন অফিস যাতায়াতের কথায় ফিরে যাই। অফিস ছুটির পর

আমরা চার পাঁচজন প্রায়ই একসঙ্গে ফিরতাম। আশেপাশে সশস্ত্র মানুষদের দেখাবার জন্যই আমাদের চোখেমুখে আঁটা হাসিখুলীর মুখোশ অর্ধাং আহা কি আনন্দ কি আনন্দ, তোমাদের ব্যবহার কি চমৎকার, আমাদের রক্ষক, তোমাদের অনুগত আমরা, তোমাদের কৃপায় আমাদের জীবন ধারণ, আমাদের বাহার।

একা একা ক্যাম্পাসের পথচলায় ছিল দারণ থুকি। কত বি ঘটতে পারে। জওয়ান কখন জানোয়ার হয়ে যায় কে জানে। একদিন ড্রাইভার আবুল আলী একা একা পথ ইটছেন। হঠাৎ এক জওয়ান হকুম ঝাড়লো হাতের ঘড়িটি দাও। নিরূপায় আবুল আলী। এই ঘটনার দুদিন পর আমার সাথে দেখা হতেই দৃঢ় করলেন তিনি : 'এ কি অত্যাচার স্যার, ঘড়িটি কেড়ে নিল !' ড্রাইভার আবুল আলী তখনও ভাবতে পারেন নি, ক' মাস পর এই জন্মু জানোয়ারের তাঁর প্রাণটিকেই কেড়ে নেবে।

পথ চলতি মানুষের এটা গুটা কেড়ে নেওয়া শুধু নয়। জওয়ানদের উৎপাত ছিল নানা রকম। কাউকে হ্যাত মজুর খাটিয়ে একেবারে নাস্তানবুদ করে ছাড়লো, কাউকে অকারণেই গালমুদ করলো, সেই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশে কিছু খিস্তি প্রয়োগ। প্রথম দিকে শিক্ষক কর্মচারীর ফ্লাটে ঢুকে ওই জওয়ানের কয়েক দফা অশালীন আচরণ করায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়টি সামরিক কর্তৃপক্ষের গোচরে আসার পর পরবর্তী পর্যায়ে ক্যাম্পাস কোঠির অন্দরে জওয়ানদের যখন তখন প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। সেই হকুম কেউ মানতো কেউ মানতো না।

তবে পাক সেনাদের এক নতুন ধরনের উৎপাত শুরু হলো যখন আশেপাশের মানুষকে ধরে ছাত্রদের আবাসিক হলে অথবা ক্যাম্পাস তাঁজী শিক্ষকদের পরিত্যক্ত বাসগৃহে ঢুকিয়ে রাইফেলের নল উঠিয়ে তারা বলতে লাগলেন জো কুচ হায়, তুম সব লে লো। সব লে যাও।' ভীত সন্তুষ্ট গ্রামের নিরীহ মানুষ যখন বাধ্য হয়ে সেই হকুম তামিল করছে, তখন সেই দৃশ্যটি সামরিক কর্মকর্তারা স্থানে ক্যামেরায় ধরে রাখতে লাগলেন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বিশ্ববাসীকে দেখাতে হবে, বাঙালিঙ্গাই লুঠেরা। যে লুঠতরাজের অভিযোগ উৎপাদিত, তার জন্য তারাই দয়ী।

আমাদের সৌভাগ্য ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত মালামাল রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ.এফ. সালাহউদ্দিন আহমদ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আতকুল হাই শিবলী ছিলেন এই কমিটির সদস্য। কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন সহকারী রেজিষ্ট্রার আ.ফ.ম. শহিদুল্লাহ। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই কমিটি পরিত্যক্ত ফ্লাট ওয়ারী সমস্ত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করেন এবং আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রীর মালিক ক্যাম্পাসে ন ফেরা পর্যন্ত তা সহতে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইসব কারণে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বাধীনতার পর ক্যাম্পাসে ফিরে দেখেছেন তাঁর গৃহ লুঠিত হয়নি এবং তাঁর সমস্ত মালামাল যথাযথভাবে রক্ষিত। আবার এই মালামাল রক্ষা কমিটির কার্যক্রম শুরু হবার আগেই কোনো কোনো পরিত্যক্ত ফ্লাটের মাল ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী কারো কারো ফ্লাটে চলে যাওয়া এবং স্বাধীনতার পর সেইসব দুর্কর্মের আবিষ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজে অবশ্য এক গোপন লজ্জার কারণ হয়ে দাঢ়ায়। এমন মহা বিপর্যয়ের সুযোগে একজন বাঙালি অধ্যাপক যে তাঁর দেশত্যাগী সহকর্মীর মালামাল হাতাবেন - কেউ ভাবতে

পারে কি ?

বাসা-অফিস, অফিস-বাসা এইটুকুই আমার প্রত্যাহিক ছাটাছাটি। বাজার ঘাটে যাওয়া আসা কদাচিৎ, অনিয়মিত। তবুও সেই চলার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে যায় কত কি ! এখানে ওখানে জওয়ানদের হৈ হল্লা লেগেই আছে, যেন এক মহোৎসব। যা খূশী তাই করার এবং যেমন খূশী চলার ওদের তখন অবাধ অধিকার। কে ঠেকায় ? সবজি বাগানের বেড়া ভেঙ্গে জ্বালানি কুড়োছে, আশেপাশের গ্রাম থেকে ধরে আনা মুরগী ছাগল হালাল করছে, কয়েক রাউণ্ড গুলি ফুটিয়ে দমদম কুকুর মারছে। প্রথম যেদিন জুবেরী ভবনের মাঠে এই কুকুর নিধন দেখা গেল, প্রতিবেশী তাহা ভাই - প্রবল আশাবাদী তাহা ভাই খুশীতে ডগমগ, যেই যেই নাচতে লাগলেন।

‘এত খুশীর কি আছে ? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

‘আরে আপনি বোধহয় জানেন না, কোনো সেনাবাহিনী চলে যাবার আগে কুকুর মেরে যায়।’

‘সত্যি !’ এবার আমার মনেও একটু আশার ছোয়া লাগে।

তাহা ভাই এমন ভাব দেখালেন যেন সামরিক রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল। আমরা সবাই তাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকি, ওরা কবে তল্পিতল্পা গুটোবে, তাহলে নিশ্চিন্তে দম ফেলা যায়। কিসু কই ? তিন চারদিন পার হয়ে গেল, ওরা নডেনা। ক্যাম্পাসে ওদের দাপটে চলাফেরা তেমনি অব্যাহত। তখন আমাদের বুকতে আর বাকী নেই যে তাহা ভাইয়ের খিয়োরী মজ্জা ওরা চলে না।

‘কি তাহা ভাই, কি হলো, ব্যাটারা যে গেল না ?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম হতাশ হয়ে।

‘তাই তো ! শালারা যে কোনো রীতিনীতি নামে না। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের নিয়ম তো এমনি ছিল !’ তাহা ভাইও শেষে মুহূর্তে প্রত্যুক্তি। তাঁর সেই হঠাৎ খূশী একেবারে উধাও।

কোনো কোনো দিন আবার মিলিটারী ভ্যানে চড়িয়ে একদল মানুষ ধরে আনা হতো। সামরিক কড়া পাহারায় এইসব ব্যক্তির পাঠা জীবনের শেষ নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে জুবেরী ভবন ও আমাদের পাড়ার মধ্যবর্তী এক পচা ডোবার নোংরা পানিতে অঙ্গুতে বসতো। আমরা নিশ্চিত জানতাম, একটু পরেই জুবেরী ভবনে ওদের জিঞ্চাসাবাদের প্রহসন এবং তারপর হাত পা বেঁধে শহীদ জোহা হলের কশাই খানায় চালান।

কখনো কখনো ‘কারফিউ’ ‘কারফিউ’ গুজবে ক্যাম্পাস গরম হয়ে ওঠে। আমরা তখন ঠিক স্থিত করতে পারিনা কী করব। একদিন অফিস ছুটি হতে না হতেই এমনি এক রব উঠে গেল আর সাথে সাথে শহরবাসী কিংবা আশেপাশের গ্রামে বসবাসকারী কর্মচারীদের চাক্ষল্য ছেটাছুটি। আমরা কজন দল বৈধে বাসায় ফিরছি তখন। সঠিক খবর কী অর্থাৎ কারফিউ আছে কি নেই, সেটা জানার জন্য আমরাও ব্যাকুল : জুবেরী ভবনের পিড়ির গোড়ায় একজন সেন্টি রাইফেল হাতে। ডঃ আবু হেনা বললেন : ‘একটু খোজ নেওয়া যায় না ওর কাছে, সত্যিই কারফিউ জারি হয়েছে কিনা !’ সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক সাদেকও বেশ উৎকৃষ্ট, কারফিউ যদি লেগেই থাকে, কটা থেকে কটা জানা দরকার। ওরা আমাকে বললেন - ‘আমরা এই গাছ তলায় দাঢ়াজ্বি, আপনি একটু জেনে আসুন ওই সেন্টির কাছ থেকে সত্যিই কারফিউ আছে কি নেই ? আপনার তো বেশ উদ্বু আসে !’ ওদের শেষ বাক্যে আমি একটু উৎসাহিত হই। তাহলে স্কুল জীবনে এক অবাঙালি পরিবারের

সাথে মেশামেশি এবং ঠাদের কাছে সফলে উর্দু শেখার প্রচেষ্টা একেবারে বিফলে যাচ্ছে না - একেই বলে 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা -'। আমি বীরদর্পে গেলাম সেই সেটির কাছে এবং নেহাঁ আনাড়ীর মতো জিজ্ঞেস করলাম : 'কারফিউ হ্যায়?' সেটি কি বুঝলো কি জানি। 'কেয়া হ্যায়' বলে বিশ্বী মুখ পিচিয়ে ধমক আড়লো 'অন্দর যাও!' এই অপ্রত্যাশিত ধমকে আমার সাহস এবং উর্দু জ্ঞান কর্পুরের মতো বিলীন। অদুরে গিয়ে আবার কোন ক্রমবৃহের মধ্যে পাক খাই, তাই 'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়' বলতে বলতে পিছিয়ে এলাম। বঙ্গুদের কাছে আমার এই নিদারণ ব্যর্থতার কথা স্পষ্ট করে বলা গেল না। সব দিক সামাল দিয়ে ঠাদের শুধু এইটুকু জানালাম - কারফিউ নেই, তবে ওদের বিশ্বাসও নেই।

অবশ্য জওয়ানদের ধমকাধমকির প্রতিবাদের প্রশ্নাই ওঠেনো। ওদের সাথে গলা চড়িয়ে পাট্টা ধমকের মতো কথা বলতে ওই নামাসে আমার স্ত্রীর ছাড়া আমি আর কাউকে দেখিনি। সে ঘটনায় পরে আসছি। সাধারণভাবে ওদের দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও বক্রিশ দাত মেলে আহলাদে আটখানা হয়ে খূশী খূশী ভাব দেখিয়ে বগল বাদনই ছিল আমাদের ধীচার পথ। এক বিকেলে আমাদের পাড়ার রাস্তায় আমরা কঞ্জন গল্পছালে মন্দু স্বরে খবরাখবর লেনদেন করছি, এক জওয়ান তখন এক টিউবওয়েল থেকে কি এক কাজ সেরে ফিরছে। আমাদের সামনে পড়তেই সেই জওয়ানকে আমরা সমবেত অভিবাদন জানালাম - 'আস, সালামু আলাইকুম, খাইরিয়া?' লোকটা বড়ই বেরসিক। কি যেন বিড় বিড় করলো। আমরা বুঝতে না পেরে বললাম - 'জি?' সে বললো : 'কুহা গ্যায়া?'

আমরা কথায় আটকে গেছি। জিজ্ঞেস করতেই হলো - 'কোন?'

উত্তরে সে এক অশ্লীল মুখভঙ্গী করে ধূমকে উঠলো - 'মুজিবুর রহমান মাদার চো-'

আমরা স্বত্ত্বির ভাব দেখিয়ে বললাম : 'দুশ্মন লোগ ভাগ গ্যায়া!'

ওদের মনের মতো এমন কথা বলেও রেহাই নেই। জওয়ানটি প্রায় গজের উঠলো - 'কাহু ভাগ জায়েগো?'

আমাদের সমবেত কঠে 'জরুর' 'জরুর' শব্দের টেও 'ফেড আউট' হলো, সেই সাথে জওয়ানের প্রস্থান এবং আমাদের হাঁফ ছেড়ে ধীচা। এমন বিপদে মানুষ পড়ে। কখনো দেখা হলে ওদের আস্ সালামু আলাইকুম না বললে আমাদের মুসলমানিতে সন্দেহ করবে। আবার কথা বললে কখন কি যে বলে তাল সামলানো দায়। তবে একটি কথা, ওদের আচরণে দারুণ স্পষ্ট যে শেখ মুজিবুর রহমান ওদের জানী দুশ্মন, তার কারণেই ওদের আরাম হারাম।

সন্তুর সালে পাকিস্তানে এক শুভেচ্ছা সফরে গিয়েও আমার ওই একই অভিজ্ঞতা। পথে ঘাটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র শিক্ষিত সব মানুষই শেখ মুজিব সম্পর্কে তিক্ত বিরক্ত। কারণ শেখ মুজিব শুধু বাঙালির অধিকারের কথা বলেন, পাকিস্তানের সকলের কথা বলেন না। সন্তুরের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে একটি অভিন্ন অপরাজেয় শক্তি হয়ে গোটা পাকিস্তানের হাল ধরতে পারে, এমন আশঙ্কায় পাঞ্জাবী বৃক্ষজীবীরা ছিলেন বড়ই উৎসিগু। লাহোরে ঘাত্রশিক্ষক কেল্লে আমাদের সংবর্ধনা শেষে বারামদায় দাঢ়িয়ে আছি, অদুরে পাঞ্জাবী

শিক্ষকদের এক জটলা থেকে শোনা গেল - 'আরে ইয়ার, ছোড়ো ইয়ে বাঁ বাঙালি হমকো
বুল করেগা' ইত্যাদি। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে উৎক্ষিপ্ত হলো আর একজনের ক্রোধ : 'বালো
বালো বালো, আরে, তুম হ্যারে বারেমে কুচ কহো!' আলোচনায় বোৰা গেল ওদ্দেয়ে
কাছে পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ পুরুষ ছিলেন ধাঙ্গা নাজিমউদ্দিন। যে সংহতির উদ্দেশ্যে
আমাদের সেই পশ্চিম পাকিস্তান সফর, ওই আলোচনা শুনতে শুনতে তার কঁকেল মড়মড়
করে উঠলো। হায়ে, এই বেরাদারানে ইসলামের সাথে আমাদের দৃঃসহবাস !

রাজা হবুচ্ছ একবার ঝুকুম করলেন তাঁর রাজ্যে কেউ কাঁদতে পারবে না। সেই আদেশ
প্রজায়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। চণ্পেটাঘাটে কিংবা মতু যঙ্গায় সব সময়েই
প্রজাগণ খিল খিল করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে হবুচ্ছের সেই উজ্জ্বল ঝুকুম জারির উদ্দেশ্যে
ব্যর্থ করে দেয়। সেই হ্যু রাজার বংশবন্দ প্রজাবন্দের মতোই আমাদের অবস্থা। হতভাগ্য
আমরা যে কজন বন্দীশিবিরে আটকে গেছি, আমরা কেবল সত্ত্বের মতো মৃত্যুমান কার্টুনের
মতো ভাঙা দাত মেলে হেসেই চলেছি, তা ওরা আমাদের অপমান করুক কিংবা
উত্তমমধ্যম দিক। অবশ্য সামরিক অফিসার অথবা জওয়ান মাত্রই সবাই সব সময়ে যে
আচরণে রাঢ়, এমন ছিলনা। তাঁদের কেউ কেউ কখনো কখনো একটু সহানৃতীশীল, এমন
ধারণাও হয়েছে আমার। একবার এক তরুণ ক্যাপ্টেনের সাথে ক্যাপ্সাসের পথে আলাপ।
আলাপ মানে 'হ্যালো' 'হাউ আর ইউ' ইত্যাদি সৌজন্যমূলক কৃশল প্রশ্নের পর তাঁর সাথে
দুচারটি বাক্য বিনিয়ন। কি এক প্রসঙ্গে ধূব শাস্তি কঢ়েই বললেন সেই তরুণ ক্যাপ্টেন :

We don't want to stay here for long.

Why? আমার জানতে ইচ্ছে হ্যাঁ।

Because our jawans have already caused a great damage to your campus.
We don't want such a beautiful place to be totally destroyed. We will leave
soon.

শেষ বাক্যটি আমার মনে খুশীর বন্যা বইয়ে দেয়। বাসায় ফিরে বললাম সবাইকে -
'আর ভাবনা নেই। ওরা চলে যাচ্ছে।' শুরু হলো অধীর প্রতীক্ষা, কবে ক্যাপ্টেনের কথা
ফলে। কিস্তু কই?

আর একবার এক ছোটোখাটো সামরিক কর্মকর্তার কথাবার্তাও আমাদের স্বত্ত্বির কারণ
হয়ে পড়ে। মিলাদ পড়ার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফ জোগাড় করতে তিনি এলেন আমাদের
ফ্রাটের দরজায়। সামনের দালানেই তিনি থাকতেন। তাই উদ্দতা রক্ষার্থে বললাম : 'অন্দর
আইয়ে !'

'অন্দর জানে কা ঝুকুম নেই।'

'কিউ?' আমি অবাক।

'বহৎসা আদমী বহৎ বহৎ থারাব কাম কিয়া-'

উদিপুরা মানুষটির চোখে মুখে একটু লজ্জা একটু দুঃখবোধ। অন্দরে ঢোকার ঝুকুম নেই,
সেই ঝুকুম ওরা মানছে -এই ব্যাপারটি তখন আমাদের কতটা আশ্বস্ত করলো ওই খাকী
পোশাকী মানুষটি জানলেন না। একটি কোরআন শরীফ নিয়ে তিনি চলে গেলেন এবং
মিলাদ শেষে কিছু মিটিও দিয়ে গেলেন আমার পুত্রকন্যার হাতে। পাক সেনাদের কাছে
মানবিক আচরণ আমরা কখনো প্রত্যাশা করিনি। তাই দৈবাং কেউ যদি সাধারণ আর

ପ୍ରାଚୀଟା ମାନୁଷେର ମତୋ ସାମାନ୍ୟ ପୌଜନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରତୋ, ଆମରା କୃତଞ୍ଜତାୟ ଗଦଗଦ ହେଁ ପଡ଼ିଥାମ। ଆମାଦେର ମାଲାମାଲ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ଏକଟୁ ରଙ୍ଗ ପେଲେଇ ଆମରା ବିଗଲିତ ହେଁଛି, ବର୍ତ୍ତେ ଗେଛି - ଆହ! କି ଦୟା ଓଦେର! କାଜଳା ମୋଡେ ମିଲିଟାରି ଜୀପେର ସାଥେ ଏକ ଦୂର୍ଟିନ୍ୟା ପଡ଼ିଲେନ ଆମାଦେର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟାକାର ଆଦୁଲ କାଦେର ସିଦ୍ଧିକୀ। ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଫେସର ଜିଲ୍ଲାର ରହମାନ ସିଦ୍ଧିକୀର ଗାଡ଼ୀର ଚାଲକ ଛିଲେ ତିନି। ଏହି ସଂସ୍ଥରେ କେ ଦୟା ତା ନିର୍ବିହେ ଆଗେଇ ଆମାର ବନ୍ଧୁ ଗୁଲିବିଜ୍ଞ ଲାଶ ପଡ଼େ ଯାଓୟାଇ ଛିଲ ତଥନକାର ଦିନେ ସାଭାବିକ ପରିଣତି । କିନ୍ତୁ ତା ହୟନି । ଜୀପେର ଆରୋହୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବରଂ ଭୀତ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଧୁକେ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଲେନ - ଡ୍ୟ ନେଇ ତାର । ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପୌଜନ୍ୟେ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଭୂତ, ଅଥଚ ମୁକ୍ତିଦୂଷ ବାଂଲାଦେଶେର ବୀର ସୈନିକ ଉଇଁ କମାଶାର ବାଶାରେ ନିକଟ ଆଜ୍ଞାୟ ହବାର ସୁବାଦେ କତ ଡ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଶିକାର ହେଁଛେ ଆମାର ଏହି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ।

ମେ ମାସେ ବ୍ୟାକେ ବେତନ ତୁଳାତେ ଗିଯେଇ ଆମାର ସତ୍ୟକାର ଅବଶ୍ୟନ ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ପ୍ରଥମ ଜାନତେ ପାରି । ଅବାଙ୍ଗାଲି ମ୍ୟାନେଜର ଜାନାଲେନ, ଆମାର ଏକାଉଁଟ ହିଙ୍କ କରା ହେଁଛେ । ଆରୋ ଜାନାଲାମ, ଯାଦେର ଏକାଉଁଟ ହିଙ୍କ କରା ହେଁଛେ, ତାଦେର କେଉଁ ଆଶ୍ୱାସାଳେ ନେଇ, ସମ୍ଭବତ ସୀମାନ୍ତ ପେରିଯେ ସବାଇ ଓପାରେ । ଏବେ କଥା ଶୋନାଯା ଆମାର ମନେ ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଏକସାଥେ ଭୀଡି ଜମାଲେ । ଆମାର ବ୍ୟାକେ ଏକାଉଁଟ ଆଟକ, ଆମି ତୋ ଆଟକ ନାହିଁ । ମନେ ମନେ ଭାବି, ଆଟକ ନାହିଁ ବା କୋଥାଯା । ବନ୍ଦୀ ଶିବିରେ ଆମରା ସବାଇ ତୋ ବୀଚାର ମୁରଗୀ । ଓଦେର ନଥେର ଡଗାଯ ବନ୍ଦୁକେର ନଲେର ମୂଳେ ଆମରା ଯଥନ ଖୁଶୀ ଆମାଦେର ଧରେ ଫୁଟିଯେ ଦିଲେଇ ହଲୋ । କେନ କୋନ ଅପରାଧେ ଆମାର ବ୍ୟାକେରେ ଏକାଉଁଟ ଆଟକ ! ଖୁଲନାଯ ଏକ ସମୟେ ଶିକ୍ଷକତା କରେଇ, ସାଂବାଦିକତା କରେଇ, ତଥନ ସ୍ୟାମ୍ପକ୍ରିୟକ ଆନ୍ଦୋଳନେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ଛିଲାମ - କିନ୍ତୁ ମେତୋ ଉନ୍ନତର ସାଲେ ଫେଲେ ଏମେହି ଏଥାନେ ଆମି ଛାପୋଷା ନିରାହ କେରାଣୀ - ତବେ ଆମାର ଉପର ଏହି ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କେବେଳେ ଯାଇ ହେବ, ଛଟ କରେ କର୍ଣ୍ଣିଲ ସମୀପେ ହଜିର ହେୟା ଠିକ ହବେନା । ଆଟଘାଟ ବୈଧୁ ସେଥାନେ ଯେତେ ହେବେ । ଦମ ଫେଲାର ଯଥନ ଏକଟୁ ସୁଯୋଗ ପେଯେଇ, ତଥନ ଚଟ୍ଟା ତଦବିରେ ଦେବ କି? ଏଦିକେ ଘରେର ଚାଲ ଡାଲ ପ୍ରାୟ ଶେଷ । ଯାଇ କରି, ଦେରୀ କରାଓ ଚଲବେ ନା, ତାହଲେ ଅନାହାରେ ମରଣ ।

ନା, ଠିକ ଅନାହାରେ ମରଣ ଆମାଦେର କପାଲେ ଲେଖା ଛିଲ ନା । ଆର ତାଇ ଓଇ ସମୟେ ଉତ୍ତିଦ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗେର ଅଧ୍ୟାପକ ଆଦୁଲ ଜ୍ବବାର କ୍ୟାମ୍ପାସେ ଫିରେ ଏଲେନ । ପ୍ରଥମେ ଏକା, ପରେ ତାର ଶ୍ରୀ ଓ ଏକଟି କାହେର ଛେଲେ । ସବାଇ ଆମାଦେର ପେଯିଁଂ ଗେଷ୍ଟ । ଡଃ ଜ୍ବବାର ଯେ ଦାଳାନେ ଛିଲେନ, ତାର ଏକଟି ଫ୍ଲାଟେ ଇଉସୁଫ ଓ ଆଫଜାଲେର ଗଲିତ ମୃତଦେହ ପାଓୟା ଯାଏ । ମେଇ ଦାଳାନେ ତଥନ ଏକା ଏକା ଥାକା ବେଶ କଠିନ । ତାଇ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ରେ ବାସ କରାର ଜ୍ଞନ୍ୟ ଡଃ ଜ୍ବବାରକେ ଆମର୍ମଣ ଆମରାଇ ଜାନାଲାମ । ଏକ କଥାଯ ତିନି ସମ୍ମତ, କିନ୍ତୁ ତୀର ଶର୍ତ୍ତ ତିନି ପେଯିଁଂ ଗେଷ୍ଟ । ବେଶ ତାଇ ସଇ । ଦୁର୍ଦିନେ ଏକ ସାଥେ ଥାକାଯ ତୁବୁ ବୁକେର ସାହସ ବାଡ଼େ । ଡଃ ଜ୍ବବାର ଏବଂ ଆମରା ଏକଇ ଛାଦେର ନିଚେ, ଏକଇ ଘରେ, କଥନେ କଥନେ ଏକଇ ଛାନାଯ ସବାଇ ଦଲ ବୈଧେ ସବେ ସବେ କତ ରାତରେ ପର କାଟିଯେ ଦିଯେଇ । ଏକବାରେର କଥା ମନେ ପଡ଼େ । ମଧ୍ୟରାତ । ହଠାତ୍ ମର୍ଟାର କାମାନେର ଶକ୍ତେ ଘରେର ଦରଙ୍ଗ୍ଯ ଜାନାଲା ଧରିଥିବ କରେ ଉଠିଲୋ । ଆମରା ଭାଯେ କାପଛି, କି ଜାନି କଥନ କୋନ ଗୋଲା ଏସ ଆମାଦେର ଜାନାଲାଯ ପଡ଼େ । ଏମନ ଏକ ଭୟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଶେର ଘରେ ଡଃ ଜ୍ବବାର ହେସେ କୁଟିକୁଟି । କି ବ୍ୟାପାର । ଏହି ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ହାସତେ ପାରେ । ମନେ ମନେ ରାଗ ହଲେ ଖୁଟ୍ଟିବ । ହାସିର କାରଣ ଜିଜ୍ଞେସ କରାଯ ଡଃ ଜ୍ବବାର

বললেন যে কামানের গর্জন শোনা মাত্রই তাহা ভাই যে ডঙ্গিতে তড়ক করে খাট থেকে সুড়ুৎ করে নেমে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়েন সেই দশ্যটি নাকি দারুণ হসির উৎস। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর অবস্থানকালে রাতের পর রাত ক্যাম্পাসে শত শত কামান গোলা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সব গোলার লক্ষ্যবস্তু কী, আমরা জানতাম না। কিন্তু গোলাগুলির শব্দে আমাদের বিন্দি রাত আতঙ্কে কাটতো। কিছুদিনের মধ্যে এমন দুস্থ জীবনেও আমরা অভিষ্ঠ হচ্ছে গোলাম। এক সময়ে তাহা ভাইয়ের স্ত্রী ছেলেমেয়ে এলেন। একতলায় তাদের ফুটে তাঁরা আবার বসবাস শুরু করলেন। এদিকে ডঃ জববারের স্ত্রী ও তাঁর কাজের ছেলেটি এসে গেলেন আমাদের মাঝে। নতুন বউ হলেও বিপদ আপনে ডঃ জববারের স্ত্রীর বৃক্ষমস্তা কর ছিল না। তাহাড়া ভূমহিলার আশ্চর্ষ সংবেদনশীল মন অল্প দিনেই তাঁকে আমাদের খুব কাছের মানুষ করে ফেললো। বিপদের দিনে দুই পরিবারের আমরা সবাই এক ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানায় পাশপাশি শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি। তখন এ রকম বসবাসই যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আমার ব্যাংকের একাউট আটকের কারণে টাকা তুলতে না পারলেও তৎক্ষণিক অসুবিধা কিছু ছিল না। কেননা ডঃ জববাব পেয়ঁইং গেস্ট ; কিন্তু ব্যাংকের একাউট আটকের অর্থ নিশ্চয়ই আমি একজন অভিযুক্ত ! কি সেই অভিযোগ ! কর্ণেল দরবারে যেতে হবে। তার আগে অবশ্যই চাই ভাইস চাম্পেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের একটু সাহায্য। শত হোক তিনি আমার শিক্ষক, এই ক্যাম্পাসের পিতৃ, আমার এমন বিপদে নিশ্চয়ই তাঁর সহযোগিতা পাবো। তাই বড় আশা করেই একদিন গোলাম তাঁর কাছে। এটা ওটা নানা কথার কাঁকে ফাঁকে অনেক চলতি ঘটনার বিবরণ দিলেন তিনি। কোথায় কোন কর্মচারীকে কিভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, কেন্দ্রীয়বৃক্ষমে বিচে গেছে ইত্যাদি কিছু কিছু খবর আর কি। অবশ্যে আমার সংক্ষেপ প্রয়োগে ভাইস চাম্পেলর ডঃ হোসায়েন ধীর শাস্তি কঠৈ বললেন : ‘দ্যাখো, আমি সবাইকে ক্ষেত্রে কথা বলি, ডঃ কাদেরকে সেদিন যে কথা বলেছি, তোমাকেও তাই বলি-ওরা যদি তোমাকে গুলি করতে চায়, তাহলে কপালের ঠিক মাঝখানের ওদের গুলি করতে বোলো, painless death, absolutely painless. আমি ডঃ হোসায়েনের মুখের দিকে কোখ তুলে তাকালাম। তিনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করতে পারেন, তা ও যেখানে জীবন মরণের প্রশ্ন। একবার মনে হলো, তাঁর ঠোটের কোশে এক চিলতে হ্যাসি। ছত্রজীবনে বন্ধুবান্ধব বলতেন, তিনি অন্যকে পীড়ন আনন্দ উপভোগ করেন। সত্যই কি তিনি তেমন মানসিক বিকারগুণ্ঠ। কিন্তু ডঃ হোসায়েনের চরিত্র কিংবা মানসিক পট চেরাচেরির সময় তখন নেই। আমার চোখে তখন সবই দুলছে সব- ভাইস চাম্পেলর পদে বহুল ওই নির্মম ব্যক্তি, তাঁর সিংহসন, তাঁর ঘরের চেয়ার টেবিল টেলিফোন সব আসবাব। বেরিয়ে এলাম। সারা শরীরে এক অশ্঵স্তিকর কাঁপুনি টের পাইছি। গলায় স্বর আটকে যাচ্ছে। ভাইস চাম্পেলর সচিব আইনুল হুদা সাহেবকে বললাম - ‘আমি কর্ণেলের কাছে যাইছি। যদি ফিরে না আসি, আপনারা দয়া করে একটু ছাড়িয়ে আনবেন। এই আমার শেষ অনুরোধ।’

পথে বেরিয়ে রাজশাহীর তৎকালীন জেলা প্রশাসক রশিদুল হ্যাসানের কথা মনে এলো। ছত্রজীবনে তাঁর সাথে তেমন আলাপ ছিল না, কিন্তু যাটের দশকে তিনি যখন খুলনার জেলা প্রশাসনের পদস্থ ব্যক্তি, তখন তাঁর সাথে আমাদের পরিচয়। আমাদের সাম্প্রতিক

কার্যক্রমে তিনি বেশ আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়ে পড়েন ওই সময়ে। আমাদের প্রতিষ্ঠান সদীপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আসতেন। শুধু একাই নয়, সহকর্মী ফার্কটী সাহেবকে সঙ্গে আনতেন তিনি। তাছাড়া খুলনার তৎকালীন পুলিশ সুপার মামুন মাহমুদ (পরবর্তী কালে ডি আই জি ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ) ছিলেন মনে প্রাণে আমাদের সদীপনের একজন পৃষ্ঠপোষক। এসব কথা মনে হতেই আমার চারপাশের অঙ্ককারে এক ফালি আলো হয়ে দেখা দিলেন জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসান। সরকারী আমলা মানেই হৃদয়হীন নয়। মামুন মাহমুদ সাহেবকে তো দেখেছি। তাছাড়া শিক্ষক মাত্রাই তাঁর হৃদয়বিপ্রির উৎকর্ষ নিশ্চিত, এমন ধারণাও সম্পূর্ণ ভাস্ত। ডঃ হোসাফেন তাঁর প্রকৃট উদাহরণ। তাই হ্রত ছুটে গেলাম জেলা প্রশাসকের কাছে। কোনো প্রত্যাশা নেই, তবুও।

জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসান তখন নিরাপত্তার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকতেন - সৈয়দ আমীর আলী হলের প্রাথমিক বাসভবনে, শহীদ জোহ হলে অবস্থানরত পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর পদাতিক ডিভিশনের একেবারে বগলে। আমার প্রত্যাশার অনেকে বেলী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন জেলা প্রশাসক। ভারত থেকে পালিয়ে আসার কারণে তিনি পাকসেনাদের খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়েন। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে রশিদুল হাসান সাহেব বললেন হঠাৎ কোন বিপদের মুখোমুখি হলে আমি যেন নির্বিধায় তাঁর নাম ব্যবহার করি এবং পাকসেনাদের বলি জেলা প্রশাসক আমার বক্তু। এমন করে যিনি সাহস দেন, বক্তু তিনি বটেই। আরো ক্ষেত্রে মাস পরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে বক্তু কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক যখন খুলমুখ্য এমন এক বিপদের মুখে পড়েন, তখনও বক্তুর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসান।

আমার ব্যাপারে বার কয়েক ছুটে গেছি তাঁর কাছে। কখনোই তিনি বিরক্ত হননি। ওই দুর্ঘাগ্রে তাঁর শ্রী যথারীতি আপ্যায়নক্ষেত্রে ক্রয়রতেন, কিন্তু টেনশনে আমার গলা দিয়ে কিছুই নামতো না। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁর শ্রী বললেন - ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যা বলা হচ্ছে সব সত্য।’ আমার বাসায় ক্যাটেন মেজরেরা সক্ষ্যাবেলায় আড়া দেয়। ওদের কথাবার্তায় সব জানতে পারি ওরা কী করছে। এখানেই ওরা কত লোক ধরে ধরে এনে মারছে। আমাদের দেশের অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের রক্ত টেনে বের করে করে মারা হচ্ছে। আমাদের ওরা বাঁচতে দেবে না। এ দেশটা ওরা শেষ করে ছাড়বে’ - বলতে বলতে জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসানের স্ত্রীর গলা ধরে গেল। তাঁর চোখ ডেজা। আমি নিশ্চলক। ওই মুহূর্তে মনে হলো ভদ্রমহিলা আমার প্রাণের মানুষ, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমাদের দুজনের অনুভবে কোনো তফাই নেই, যদিও তাঁর বাসার গেটে শশমন্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী এক পাঞ্জাবী তখনও দাঙিয়ে আছে। একটু পরে জেলা প্রশাসক অফিস থেকে ফিরতেই সেই অবাঙালি যথচ্ছুটই তাঁকে অভিবাদন জানালো।

রশিদুল হাসান সাহেবের পরামর্শ মতোই মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মতিউর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরপরই ডঃ রহমানের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। উদারপন্থী শিক্ষকমণ্ডলীর সাথেই ছিল তাঁর ওঠাপসা। তাছাড়া পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জর্গালিস্টের প্রাক্তন সভাপতি পাকিস্তান টাইমসের বিশিষ্ট সাংবাদিক বক্তু সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ একবার রাজশাহী বেড়াতে এসে আমার বাসায় ওঠেন। ওই সময়ে তাঁর মূলকি তাই ডঃ মতিউর রহমানের সাথে আমার

সুস্পর্শের সেতু তিনিও কিছুটা নির্মাণ করে যান। তাই ডঃ রহমানের শরণাপন্ন হওয়ায় কোনে বাধা ছিলনা। একটু সংশয়, পুরোনো সম্পর্ক কর্তৃ মর্যাদা পাবে, কেননা দখলদার বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে তখন তাঁর দহরম।

ব্যাংকের একাউন্ট আটক অবশ্যই একটি মানুষের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগের নির্দেশক এবং সেই কারণেই পথে ঘাটে দফতরে আমার মতো দাগী আসামীকে সহকর্মীরা একটু এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। আশেপাশের মানুষের এই মনোভাব বুঝে ফেলায় উপরাচক হয়ে কারো সাথে মেলামেশার উৎসাহ আমার কমে গেল। আর যাই হোক দুঃসময়ে কাউকে বিব্রত করা উচিত নয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, একাউন্ট ছিঞ্জ করা হলো কেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমার দফতরে হেলমেট কেন পাওয়া গেল, সেই কথা তো ভাইস চাস্টেলরকে বলা হয়েছে। আর আমার দফতরে ব্যাংক লুটের ভাগ বাটোয়ারা? আমি যে ক্যাম্পাসেই ছিলাম না। আর লুঠ কে বা কারা করেছে, পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ তা ভালো করেই জানে। তবে? উন্মস্তর গণ আন্দোলনে আমার সামান্য ভূমিকাও কি এখন অপরাধ বলে গণ্য?

সেই যে কথায় বলে, যেখানে বাবের ভয় সেখানেই সঞ্চয় হয়। আমার ক্ষেত্রে তেমনি ফল। ওই সময়ে একদিন আকাশ বাধীর সংবাদ পরিক্রমায় ভাষ্যকার প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বাষ্পলাদেশের তৎকালীন অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে উদাস কষ্টে বলে উঠলেন : ‘তাই বাষ্পলাদেশের সামনে এখন একটিই প্রশ্ন’ – ‘শাস্তি না সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম’ এটুকু শব্দেই আমার হংপিণ্ড ধূক করে উঠলো। এই বাক্যটি তো আমার লেখা একটি গ্রনের প্রথম চরণ। সন্দেহমুক্ত হলাম তৎক্ষণাৎ। ভাষ্যকার পুরো শুরুটি আবৃত্তি করলেন। আমার প্রতিক্রিয়া তখন মিশ্র। গানের রচয়িতার নাম ভাষ্যকার কলেননি। তখন নাম না বলার সঙ্গত কারণও ছিল। তাই সেই মুহূর্তে ভয় কেটে গেছে বরং ধানিকটা ষষ্ঠি। আবার অন্যদিকে আমার লেখা একটি গান স্বাধীনতা যুক্ত উচ্চারিত হচ্ছে, তাতে আমার অনুভবে এক ধরনের গর্ব ও তৃপ্তি। আমার লেখা গণসঙ্গীতের যে বইটি প্রকাশিত - চেতনার সৈকতে - সেখানে এই গানটি নেই। তাহলে কেমন করে এই গানটি ওপারে গেল? হ্যাত শিল্পীর মুখে মুখে। ওই গানে দুটি চরণ ছিল এই রকম—

‘আপোষ না প্রতিশোধ ?

প্রতিশোধ প্রতিশোধ, রক্তের প্রতিশোধ রক্তে,

জাগো ওঠো দুর্বার ভাঙ্গে করো চূরমার

লাখি মারো জালেমের তখ্তে !’

সংবাদ পরিক্রমায় আমার গানের আবৃত্তি শুনতে স্বাধীনতার যুক্তে জীবনকে তুচ্ছ করে কিছু করতে না পারার দুঃখটা হ হ করে বেড়ে গেল। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে ‘রক্তের প্রতিশোধ রক্তে’ কথাটি একদিন আমিই লিখেছিলাম। আমার সেই দৃশ্য মেজাজ কোথায় গেল। রক্তের প্রতিশোধ রক্তে নেওয়া দূরে ধাক, ক্রীতদাসের মতো অনুগত বশবেদ হয়েও আজ জীবন রক্ষা দায়। শুধু কি ডঃ মতিউর রহমানের মতো পাকসেনাবাহিনীর দোসরের কাছে তদ্বির, বিপদমুক্ত হবার জন্য সৃষ্টিকর্তার দরবারেও প্রার্থনা চলছে নিয়মিত। ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌবানা লুংফুলাহ প্রায় সঞ্চায় আমাদের সঙ্গ দান করতেন। তাঁর কাছে আমরা দোওয়া দরদের পাঠ নিতাম। নিয়মিত

নামাজ এবং লক্ষ লক্ষ বার দোওয়া ইউনুস পড়া হয়ে গেল আমাদের।

যেদিন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরা, সেদিন সকাল থেকে আমার স্ত্রী ও শ্যালিকা নূরী দোওয়া ইউনুস পড়ার প্রতিযোগিতায় নামলেন। যাখার কাপড় টেনে জায়নামাজে বসে গেছেন দুজন। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে রিকশায় চেপে জুবেরী ভবনের সামনে রাস্তার কালভাটের কাছে এলাম আমি। এতটুকু পথ রিকশায় আসার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য। রিকশালাকে বললাম, ‘আমি যদি ফটা দুয়েকের মধ্যে না ফিরি, আমার বাসায় গিয়ে খবর দেবেন যে আমি বেরোতে পারছিনা।’

জুবেরী ভবনের বারান্দায় উঠতেই দেখি সেই জওয়ান সেন্ট্রি যাকে কারফিউ এর কথা জিজ্ঞেস করায় প্রচণ্ড ধমক খাই একদিন – সে পাহারায়। মনটা দয়ে গেল।

‘কেয়া মাংতা?’

‘ক্যাল্টেন সাহাব সে মূলাকাত –’

‘কিউ?’

‘তন্থা মিলতা নেহি – ইসি লিয়ে –’

আমার কথা শেষ করতে দিল না সে। দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে উঠলো :

‘মুজিবুর রহমান সে তন্থা লে লো।’

ওই সময়ে আমার বুঝিপুঁজি একেবারে বিলুপ্তপ্রায়। তার উপর এমন ধর্মকাধর্মকি। তখন মনেই এলোনা, জওয়ানের কথায় অসহযোগ আলোলনের ইঁগিত। তবু বিনীত কঠে বললাম –

‘য্যায় গরীব মূলাঞ্জিম হ্য।’

‘গরীব মূলাঞ্জিম?’ আবার বিদ্রুপাত্তক জ্ঞাত খিচিয়ে চেচিয়ে উঠলো সেই জওয়ান। তারপর তার দুই চোখ আমার দুচোখের সামনে নামিয়ে বিশ্রী মুখভঙ্গি করে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি অক্ষরে ওজন ঢেলে ঢেলে – ‘বদমাশ কাহেকা – চল উধার।’ দুহাত ধরে টেনে হিচড়ে সে নিয়ে চললো আমাকে পশ্চিম লাউঙ্গে – টেবিল টেনিস খেলার ঘরে। সেখানে একটি বেঞ্চে আমাকে ঢেলে বসিয়ে দিল ‘বয়ঠ হ্য।’

ওই ঘরটির আসবাব তখন অন্যরকম। এদিক ওদিক দু-একটি টেবিল। এলোমেলো কিছু চেয়ার বেঞ্চ। উত্তর পশ্চিমে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে খান দুয়েক চেয়ার আর পিছনে দু সারি স্টীলের ফাইল ক্যাবিনেট। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দফতরগুলি কানা করে তখন এ রকম কিছু কিছু আসবাব যখন ফটা খুন্দী ওরা তুলে আনে।

ক্যাল্টেনের প্রতীক্ষায় একটি বেঞ্চে আমি কাঠ। এক একটি মুহূর্ত যে তখন কতটা সময়! নিঃশ্বাস গ্রহণবর্জন বেশ স্পষ্ট। চোখে মুখে ভয়ের ছাপ নিশ্চয় আরো প্রকট। লাউঙ্গের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে ধীর পায়ে উঠে এলেন একজন খাকী পোশাকী মানুষ, তবে সামরিক বাহিনীর কেউ নন-তিনি পুলিশ, সব ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার অফিসার। বাঙালি। তিনি বসলেন আমার পাশে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার বিষয় জ্ঞানতে চাইলেন, তারপর খুব নিচু গলায় বলতে লাগলেন তাঁর কাহিনী, এক মর্যাদিক বর্ণনা। পঁচিশে মার্চের পর কোথায় তাঁর কেমন কেটেছে, কেমন করে সরদহ পদা পাড়ে শত শত মানুষকে ব্রাশ ফায়ারে একেবারে হত্যা করা হয়েছে ইত্যাদি। সেই মত্তুর স্তুপের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে অক্ষত পড়েছিলেন তিনি। সেটা টের পেয়ে এক জওয়ান আবারও গুলি করতে উদ্যত

হতেই তার পা জড়িয়ে ধরেন এই পুলিশ অফিসার। কেবলে প্রাণ ডিক্ষা প্রার্থনা করেন তিনি। জওয়ানটির বোধহয় একটু দয়া হয়। তিনি প্রাণে ধাঁচেন। পুলিশ অফিসার আরো জানালেন কেমন ছলচাতুরী করে শত শত লোককে পদ্মার পাড়ে সেদিন নেওয়া হয়। ওই এলুকায় পাকসেনারা ভালো মানুষের মতো শাস্তি নির্বাহ কর্তে এ রকম ঘোষণা দেয়—আমরা চাইনা হিন্দুরা এদেশে থাকুক, ওরা চলে গেলেই আমরা খুশী। তাই আমরা কিছুই বলবো না, হিন্দুরা সবাই এসো নদীরে পাড়ে, কোনো গোলমাল শোরগোল কোরো না, ওপারে হিন্দুদের চলে যাবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই রকম আবাসে সরল হিন্দুরা যখন দলে দলে পদ্মার পাড়ে এলো, তখন অনেক মুসলমানও সেই সারিতে ভিড়ে যায়। তাদের ভাবনা, যদি এই সুযোগে হিন্দুদের সাথে এপারের শৃঙ্খান এই ভয়ংকর দেশটা ছেড়ে ওপারে চলে যাওয়া যায়, মন্দ কি। পুলিশ অফিসার সেই রকম সুযোগ পেতে চেষ্টা করেছিলেন। তখন তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি যে সেটাই ভাষ্টা, একত্র জড়ে করে ব্রাশ ফায়ারে হত্যার জন্য ভাষ্টা। ওপারে মানে পদ্মার ওপারে ভারতে নয়, ওপারে মানে জীবনের পরপারে চালান। সেটা কেউ ভাবেনি। সেই পুলিশ অফিসারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শুনলাম চুপচাপ। ভদ্রলোক বললেন, ‘আমি যে কেমন করে বৈচে আছি, আমি জানিনা—’ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো তার। আমার চোখ মুখ কিন্তু ভাবলেশহীন, একেবারে পোকার ফেস। কে জানে আবেগের কণামাত্র প্রকাশে কি ঘটবে। তাছাড়া বিশ্বাস নেই কাউকে। আমার মনের কথা, মনের প্রবণতা এবং মনের কোনদিকে টান সেটা জানার জন্য ভদ্রলোক যে গল্পের ফাঁদ পাতেন নি, কে বলতে পারে। তাই আমি নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পর একজন ক্যাটেন এলেন, অল্পবয়সী। কিন্তু মাঝেই টাকের আক্রমণ, গোলগাল ফর্সা, নাম বোধহয় ক্যাটেন ইয়াকুব কি ইয়াসিন। আমাকে ডাকলেন তিনি। সেই রুক্ষ খিটখিটে জওয়ানটি আবার আমাকে একটা ধারনা দিয়ে ক্যাটেনের টেবিলের কাছে এগিয়ে দিল। স্টীল কাবিনেট থেকে ফাইল বের করলেন ক্যাটেন। পাতার পর পাতা উল্টে শেষে একটি পৃষ্ঠায় অনেকক্ষণ চোখ বুলিয়ে ক্র কুচকে আমাকে একঘলক জরীপ করে ক্যাটেন জানালেন, আমার বিষয়টি কর্ণেল ছাড়া কেউ নিশ্চিতি করতে পারবে না। কর্ণেলের অফিস ওই ‘জুবেরী ভবনেরই একতলার উত্তর-পশ্চিম সারির দ্বিতীয় ঘর। সেদিন তিনি অনুপস্থিত। আমাকে আবার আসতে বলা হলো।

দ্রুত পায়ে বাইরে এলাম আমি। না, এভাবে শুধরো সাপের গর্তে ফস করে পা দেওয়া উচিত হচ্ছে না। আরো আটঘাট ধাঁধা চাই। তাই আবারো ডঃ মতিউর রহমানের শরণাপন্ন হই। ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি নিশ্চয় অনেক কিছু অবগত। হ্যা, বেশ কেতাদুরস্ত ভাবেই নিদিট একদিন আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন ডঃ রহমান। সবশেষে আমাদের কথা গিয়ে ঠেকলো প্রশাসনে বাঙলা ভাষা প্রচলন প্রসঙ্গে। এই বাঙলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারেই শুধু নয়, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আমি যে পাকিস্তানী খেতাব বর্জনের জন্য ভাইস চাস্পেলরকে কৃপার্য্য ও চাপ দিয়েছি, সেটাও অভিযোগ আকারে এলো। অতএব আমার বুঝতে আর বাকি রইলো না যে আমার বিরুদ্ধে তাবৎ অভিযোগ স্বয়ং আমার শিক্ষক ভাইস চাস্পেলের প্রণীত। আমার সপক্ষে তখন একমাত্র শুৎসই যুক্তি : যা কিছু করেছি, ভাইস চাস্পেলের ডঃ হোসায়েনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যেই করেছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিসার হিশাবে সেটাই ছিল আমার

দায়িত্ব। সব রকম তাবে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের পর ডঃ রহমানের একটি উচ্চারণ আমার মনে শত শত প্রতিষ্ঠানির সূচনা করলো : 'But you are now the scapegoat. পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ঘনিষ্ঠ দোসর হবার সুবাদে ডঃ রহমান অনেক দুর্কর্মের নায়ক। গণিত বিভাগের অধ্যাপক হিস্বুর রহমান সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্টের ব্যাপারে তার সক্রিয় ভূমিকা সর্বজনবিদিত। আবার কোনো কোনো সহকর্মীর প্রতি সাহায্যের হাতও তিনি বাঢ়িয়ে দেন। আমার মাথার উপরে সরু সূতোয় ঝুলন্ত খড়গটি নামাতে তার তৎপরতা স্মর্তব্য। তেমনি ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরীর মতো দু চারজন বক্সুর প্রতি তার কিছুটা আস্তরিকতাও হয়ত ছিল। একাত্তরের শেষ দিকে ঘটনাচক্রে কলাবাগানে আমার শুশুর বাড়ীতে একবার এসেছিলেন প্রফেসর চৌধুরী। সেই সুযোগে আমি সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম - 'স্যার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি যেখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি সাধারণ সম্পাদক হয়েও কেমন করে ঝুটুবামেলামুক্ত?' প্রফেসর চৌধুরী একটু হেসেছিলেন। তারপর এটা ওটা তাঁর নানা কথায় কথায় বোঝা গেল, ডঃ মতিউর রহমান হয়ত তাঁর প্রতি ততটা বৈরী নন। স্বাভাবিক নিঃস্বার্থ বক্সুরের সুফল লাভ করেন প্রফেসর চৌধুরী।

দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগেই ডঃ মতিউর রহমান টের পেলেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ধীরে সুস্থে খোপার্জিত লুটিত তাবৎ সম্পদ গুচ্ছিয়ে বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি পক্ষিয় পাকিস্তানে গেলেন। আর ফিরলেন না। রাজশাহী ছেড়ে যাবার আগে বিভাগীয় ছাত্র সহকর্মীদের সাথে তাঁর গ্রন্থ ফটো তুললেন আলোকচিত্রী আব্দুর রাজ্জাক। ছবি তোলাতুলির কথা শুনে আমার খটকা লাগলো। এমন সময় ডঃ রহমান আমার দফতরে একদিন এলেন, হাত বাঢ়িয়ে দিয়ে বললেন :

'হ্য চলে !'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল 'Or good? সাথে সাথেই একটু সামলে নিয়ে আবার বললাম : 'Please don't leave us for good'.

'Of course not.' ডঃ রহমান মন্দু হেসে চলে গেলেন। সেদিন আমার অফিসে তখন উপস্থিত ছিলেন ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক জাফর রেজা খান। তিনি বললেন :

'আচ্ছা, আপনার কি বুদ্ধিশূলি কিছুই নেই ?'

'কেন ?'

'কেন আবার, যে মানুষটি জেনারেল নিয়াজীর সাথে ওঠেন বসেন, তিনি বিদ্যায় নিচেন আপনার কাছে প্রশাসন ভবনের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঢুকে বিদ্যায় নিচেন, তা কি শুধু বিজ্ঞান সম্মেলনে যাবেন বলে ?'

'তবে কি এ- কে-বা রেই?' আমার বিশ্বাস হতে চায় না।

'হ্যা - '

ডঃ রহমানের চলে যাবার তখন একটাই অর্থ, পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এই দেশটা আর তাদের কবজ্জায় রাখতে পারছে না। আবহাওয়ার অগ্রিম সংবাদ প্রাপক সবাই তাই তল্পিতল্লা গুটোছেন। এদিকে ডঃ রহমানের অনুপস্থিতিতে কদিনের জন্য বিভাগীয় প্রধান হয়ে যে অবঙ্গালি অধ্যাপক আনন্দে উগময় হলেন, তিনিও এতটুকু অনুমান করতে

পারলেন না ডঃ রহমানের অভিপ্রায়। যখন দেশ স্বাধীন হলো, তিনি দেখলেন পালাবার পথ নেই। ডঃ রহমানের অগ্রস্য যাত্রা ছিল সাধারণ অনাড়ম্বর, কিন্তু আমাদের কাছে দারুণ তৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তানীরা এদেশটার বুকের উপর চেপে বসে আমাদের শাসনোধ করতে পারবে না এবং যুক্তে তাদের পরাজয় যে অবশ্যস্থাবী – এমন ধারণা আমাকে যতই পায় ততই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। আমার কথাবার্তায় সেই মনোভাব নানাভাবেই বেরিয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতার কোনো খবর পেলেই জিজ্ঞাসা করে জানবার ছুতোয় মুখে মুখে সেটা পরোক্ষভাবে প্রচার করি। একদিন আমার কি একটা কথার জ্বাবে শ্টুডেন্টস্ গাইড্যুস্ এবং কাউন্সেলিং –এর ডাইরেক্টর ডঃ মোসলেম হৃদা হেসে বললেন :

‘একজন সাইকেলজিস্ট হিশাবে বলছি। আপনার কথাবার্তায় wishful thinking পাচ্ছি। তাই মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপের কথা একটু সাবধানে বলবেন।’

ডঃ হৃদা ভারত ফেরত। খুব সাবধানী। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর থেকে কেউ কোনো মতামত প্রকাশ করলেও আমার চেখে মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না।

একদিন ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আহমদুল হক বেশ দাপটের সাথেই শোনালেন শৌর্যে বীর্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের স্থান বিশ্বের মানচিত্রে কোথায়। অতি শিগগির যে এই সৈন্যবাহিনী উপর ভারতের বুক চিরে আমাদের জন্য ঢাকা থেকে লাহোর যাবার একটি করিডর নির্মাণ করে দেবেন, সে বিষয়েও পুরো লিঙ্গতা দিয়ে অধ্যাপক খান শুন্যে কল্পিত স্টীয়ারিং-এ দৃহাত রেখে দুচোখ সামান্য মুক্তি আবেগতাড়িত কঢ়ে বললেন :

‘তখন গাড়ী চালিয়ে সোজা লাহোর যাওয়া যাবে।’ আমি অবাক হয়ে শুনি মানুষটির সাথ।

আবার একদিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মফিজ উদ্দিন আহমদ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে করতে বললেন :

‘পাকিস্তানী বাহিনীর মতো এমন সুসংগঠিত সৈন্যদলকে হঠাতে গেলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে মাঠে নামতে হবে।’

‘অর্থাৎ?’

‘অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যদের এদেশে এসে যুদ্ধ করতে হবে। আর তাতে ভালো হবে না মন হবে, এখনই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।’

‘কেন?’

‘কেন?’ দুচিত্তামগ্ন হলেন মফিজ সাহেব, ‘এক দেশের সৈন্য যুদ্ধ করে অন্য দেশের ভিতরে এলে আর ফিরে যায়না। ইতিহাস তা বলেনা। তাই ভারতীয় সৈন্য যদি আসে, তারাও ফিরে যাবেন।’

পরিস্থিতির এমন নিরপেক্ষ আলোচনাতেও আমি মীরব। সাবধানের মার নেই, সেটাই ছিল তুর্কনকার প্রধান শিক্ষা। অর্থাৎ ইতিহাস যে মাঝে মাঝে উল্টো কথাও বলে শেখ মুক্তিব ও ইন্দিরা গান্ধী সেটাই প্রমাণ করে গেলেন।

আবার ফিরে যাই পিছনে। ডঃ মতিউর রহমানের কাছে আমার জ্বাবদিহি শেষ হতে না হতেই কর্ণেলের জীপ এসে দাঢ়ালো তাঁর বাসার সামনে। ডঃ রহমান বললেন —

‘You need not stay here. I will explain everything.

একটু ঘূর্কে কর্ণেল সাহেবকে একটি সালাম জানিয়ে আমি চলে এলাম। পরদিন ডঃ
রহমান আমার অফিসে এলেন। হাসি হাসি মুখ।

‘চলিয়ে।’

চলাম তার পিছু পিছু ব্যাংকে। অবাঙালি ম্যানেজার আজিমুল কাদের একটু দূরে
ক্যাশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখিয়ে ডঃ রহমান চোখ টিপে তাকে ইশারা
করলেন যার অর্থ—ক্লিয়ারড ছোড় দো। আমার বুক থেকে এক বড় বোঝা নেমে গেল।

আমাকে রেহাই দেবার ব্যাপারটি অবশ্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত
নীতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কতিপয় বিদেশী সাংবাদিক এসেছিলেন যে মাসের কোনো এক
সময়ে। তাদের রাজশাহী ভ্রমণ ছিল পুরোপুরি সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয় ও শহর পরিস্থিতি ইহসব সাংবাদিককে কতটুকু জানতে দেওয়া হবে, তা
আগে ভাগই স্থির করা হয়। তাই মাত্র দূজন অধ্যাপক হলেন সাফাই সাক্ষী। তাদের
কাজই ছিল সবকিছু তেকেতুকে বলা। কী বলেছিলেন সেই দূজন অধ্যাপক, তা সহজেই
অনুমান করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই পণ্ডশ্রম। সাংবাদিকদের দৃষ্টি ও অনুভবকে ফাঁকি
দেওয়া সম্ভব হ্যনি।

গণহত্যা লুঠন ধর্ষণ ইত্যাদি খবর সারা বিশ্বে যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, চারদিকে
ততই ধিক্কার, ততই বেকায়দায় ফেসে যায় পাকিস্তান। সমস্ত ঘটনা ‘অভ্যন্তরীণ ব্যাপার’
বলে গলা ফাটিয়েও কুল পাওয়া যাচ্ছেন। পারিবারিক কলহ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ঠিকই,
কিন্তু গৃহে আগুন লেগে গেলে তার আপটা প্রতিক্রিয়াকেও স্পর্শ করে। তবুও দেশের
পরিস্থিতির তোবড়ানো চোয়ালে স্বাভাবিকতাৰ প্রযোগ পৰাতে দখলদার বাহিনী নানা
ফন্দির আশ্রয় নিল। হত্যা নির্বাতন যেমন চলছে, তেমনি চলবে, তবে আড়ালে। মক্ষে শুধু
ভালো মানুষের অভিনয়। তাই একের প্রয়োগ ঘোষণা জারি ও মায়াকারা।

একুশে মের মধ্যে দেশত্যাগী সংগঠনকে ঘরে ফেরার আকূল আবেদন জানালেন
ইয়াহিয়া খান। চৰিষে যে ঢাকচেলি পেটা হলো, ‘দুস্প্রাহের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর।’ ৩০
শে যে গঠিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনৰ্বিন্যাসের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এক কমিটি।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চাম্পেল ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এই কমিটির
চেয়ারম্যান ও বি. এন. আর. পরিচালক ডঃ হাসানুজ্জামান তার সদস্য—সচিব। অন্যান্য
সদস্য ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ মুহুম্মদ আকুল বারী, ডঃ মকবুল হোসেন
ও ডঃ সফিউদ্দিন জোয়ার্দার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ মোহর আলী ও ডঃ
আ. ফ. ম. আকুলুর রহমান। একাত্তরের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই চমৎকার কমিটি, যদিও ডঃ
জোয়ার্দার একটু দলচূট। তার প্রতি এই অনুগ্রহ কেন, বোঝা গেল না। একুশে অগস্টের
ভিতর এই কমিটির সুপারিশ পেশ করার সময়সীমা নির্দিষ্ট। যথ উৎসাহে শিক্ষার
পুনৰ্বিন্যাসের কাজে মহা তৎপর হলেন আমাদের ভাইস চাম্পেল ডঃ হোসায়েন। প্রায়ই
চলতে লাগলো আহারবৈঠক। সভাগৃহে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই, তবে আলোচনার
ভাষা ভাষা অংশ নানা মুখে মুখে গোপনীয়তার বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। একদিন
শুনলাম, পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে শিক্ষক বদলী প্রথা চালু হতে যাচ্ছে।
অর্থাৎ কেউ কোথাও দুষ্টি করলেই তাকে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে,
চাই কি এক অক্ষল থেকে হাজার মাইল দূরে অন্য অক্ষলে সরিয়ে দেওয়া হবে।

পহেলা জুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার নির্দেশ জারি হলো। দোসরা অগস্ট কুস

শুরু। পহেলা জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষকদের কাছে যোগদানের অনুরোধ। এই অনুরোধ রক্ষা না করলে চাকরীর অবসান, সে কথাও হৃত্কূম নামায় স্পষ্ট।

এখনেই শেষ নয়। বিদ্রের মানুষকে ধোকা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো পাকিস্তান সামরিক সরকার। দেশে বিদ্রে সাফাই সাক্ষী জোটানো শুরু হলো। জিল নাইট, জেমস কিলফেডার, জেমস টিন ও আর্নেস্ট আর্মস্ট্রেং নামে চারজন ব্রিটিশ পালামেট সদস্য এলেন ১১ই জুন। দেশটা ঘুরে না ঘুরেই ইয়াহিয়ার গোপন ঘরে বসেই মিসেস জিল নাইট ১৮ই জুন এক লম্বা সাটিফিকেট দিলেন- ‘tiny fragment of the scene’ তার দেখা হয়ে গেছে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানের প্রশংসন করলেন তিনি মুক্তকচ্ছ।

একাত্তরের মুক্তিযুক্ত বিরোধী (বর্তমানে জাতীয় কবরস্থানে সম্মানিত) মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর ১৫ই জুন চমৎকার এক বিবৃতি আড়লেন। ব্যক্তিজীবনে কোনো ধর্মচরণ কিংবা নৈতিকতার ক্ষেত্রে বালাই ভদ্রলোকের ছিল না, তবে রাজনীতি জীবনে ধর্মব্যবসায়, সাংগ্রামিকতা ও ভারত বিরোধিতা ছিল সবুর সাহেবের প্রধান পুঁজি। এই অভিনব বিবৃতির ক্ষেত্রে সেই অস্তপ্রয়োগ করে তিনি বললেন, ‘এ দেশের কিছু সংখ্যক মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দুস্থান নিয়ে গেছে এবং এখন তাদের ফেরার ইচ্ছে থাকলেও ভারত তাদের ফেরায় বাধা সৃষ্টি করছে।’ উত্তীবন বড়ই উর্বর এবং উষ্টু। এক কোটি মানুষ প্রলুপ্ত হয়ে চলে গেল। আবার ভারত তাদের আটক করেও রাখছে। বাহু চমৎকার !

জুন মাসের এগারোই সকলের প্রতি সাধারণ ধৈর্যণা করে ইয়াহিয়া খান তার মহানুভবতা দেখাতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ৭ই জুন তারিখে পাঁচশ ও একশ টাকার মোট বাতিল ঘোষিত। অর্থাৎ যদি কেউ ভারতে কৃত অক্ষের টাকা নিয়েও থাকে, তার কার্যকারিতা নষ্ট।

ব্রিটিশ পার্লামেট সদস্য মিসেস জিল নাইট পাকিস্তান ঘুরে যাবার পর বিভিন্ন দেশের পার্লামেট সদস্যগণ একে একে আস্তে শুরু করলেন। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো তাদের গতিবিধি। কারণও ছিল। ২৬শে জুন আর্থার বটম্লের নেতৃত্বে এলেন ব্রিটিশ পার্লামেট প্রতিনিধিদল। হেলিকপ্টারে উড়ে এসে তারা রাজশাহী ঘুরে গেলেন। ভাইস চ্যাম্পেল ভবনের লাউঞ্জে উপস্থিত শিক্ষকদের সাথে পরিস্থিতি বিষয়ক কথাবার্তা বললেন তারা। ওদেরই সফরসঙ্গী আই-টি-ভি সাংবাদিক একটি টাইপ রাইটার ব্যবহার করতে চাওয়ায় কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে আমি তাকে নিয়ে গেলাম স্টেনোর ঘরে। তিনি ফটাফট সংবাদ টাইপ করতে শুরু করলেন, আমি পাশে দাঢ়িয়ে নিশ্চূপ। মন আমার উশ্শু। আমি যে কিছু বলতে চাই, ভদ্রলোক বোধহয় বুঝেই পাশ ফিরে স্থপন্থ তাকালেন আমার চোখে। আমার ডিতবে তোলপাড়। আশেপাশে দ্রুত তাকিয়ে নিরাসক আবেগহীন মন্দু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম :

‘Have you visited Shahib Bazar?’

ভদ্রলোক আমার চোখে চোখে তাকিয়ে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করলেন : ‘Yes, burnt down.’ তারপর এমন এক মুহূর্তে করলেন আই-টি-ভি সাংবাদিক দেন সামরিক কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নির্যাতন ডগুমী সবই তিনি বুঝে ফেলেছেন। আর কথা বলা নিষ্পয়েজন। তাছাড়া কোন কথা কিভাবে ফাস হয়ে যায়, শেষে সর্বনাশ।

লাউঞ্জে ফেরার পথে আবার যেই ভাইস চাম্পেলরের অফিস কক্ষে ঢুকেছি, দেখি সেখানে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সফরসঙ্গী আলোকচিত্রী রফিক সাহেব (নাম সঠিক বললাম তো!) কোথাও টেলিফোন করার চেষ্টা করছেন। তাঁর সাথে আগে আমার একটু আদটু পরিচয় ছিল। হঠাৎ তাঁকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম :

‘কি দেখলেন ওঁরা চারদিকে?’

‘সব দেখেছেন স-ব। হেলিকপ্টার লো-ফ্লাই বৰে এসেছে। গ্রামের পৰ গ্রাম যে ধৰ্সন, তা দেখেই বোঝা গেছে।’

আমি অফিস থেকে বারান্দায় বেরোতেই দেখি আর্থার বটম্লে ও জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসান আলাপ করছেন। আলাপ নয়, বৰং জেরা বলাই ভালো। আর্থার বটম্লের প্রশ্নের মূল বিষয় ছিল সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পৰ দেশভ্যাগী মানুষেরা ভারত থেকে ফিরছেন কিনা, ফিরলে কোন পথে এবং তার সংখ্যা কত। আর্থার বটম্লের উল্টো পাশ্টা প্রশ্নের জবাব ধীরে ধীরে দিচ্ছিলেন জেলা প্রশাসক। গোদাগাড়ী সীমান্ত পথে কত জন ফিরেছেন, সে প্রশ্নের জবাবে দু একবার হাঁচট খেলেন তিনি। বটম্লে সাহেব গন্তীর মুখে চোখে চোখে তাকিয়ে আছেন। আলগা আলগা উত্তর দিয়ে কি ইচ্ছে করেই তাঁর সন্দেহ বাড়ালেন জেলা প্রশাসক রশিদুল হাসান !

আর্থার বটম্লে যে বাংলাদেশের সত্যিকারের ছিপ্ট তুল ধরবেন, এটুকু আশা আমার ছিল। আর হলোও তাই। বটম্লের সমালোচনায় পাকিস্তান সরকার অস্বীকৃতিবোধ করলেন। ৬ই জুলাই সরকারী এক ভাষ্যে বলা হলো, ‘বটম্লের সমালোচনা ‘Unfair’। বটম্লের স্পষ্টবাদিতার ফল দাঁড়ালো এই যে পক্ষবৰ্তীকালে সফররত কোনো প্রতিনিধিদলকেই কিছু দেখতে দেয়া হলো না। যেমন ৫ই জুলাই এলেন দূজন জর্মন পার্লামেন্ট সদস্য। চট্টগ্রামের সমূজ বন্দরে কি কি সুবিধার ব্যবস্থা আছে, এসব দেখেই তাঁরা চলে গেলেন। ১০ই জুলাই এলেন অস্ট্রেলীয় পার্লামেন্ট সদস্য লেন এস রীড। সাধারণভাবে যে সব এলাকা বন্যা পীড়িত হয়, সেগুলি দেখিয়ে তাঁকে বিদেয় করা হলো। কানাডীয় পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদল এলেন ১৩ই জুলাই। খুলনা ও যশোরের কিছু গীর্জা এবং চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মন্দির তাঁদের দেখানো হলো। ২৯ শে জুলাই এলেন তুর্কী পার্লামেন্ট সদস্য। চট্টগ্রামের হস্তশিল্প দেখার সুযোগ পেলেন তিনি।

এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করেও কিন্তু শেষ রক্ষা করা যাচ্ছিলো না। সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেই বেরিয়ে গেল ‘বাংলাদেশ কি সাচ্ছী কহানী’, বেরিয়ে গেল এইচ্ আসকারী রিজভাইর লেখা The Truth. লাহোর থেকে জিয়া রিজভাই কর্তৃক প্রকাশিত এই বইটি পরবর্তীকালে পাঞ্জাব সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করলো। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের সচেতন বুজুর্জীবী সমাজে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এমন কি কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও ঔপন্যাসিক শওকত সিন্দিকী এ দেশে আসা যাওয়ার ফলে আমাদের অনেকের সাথে যাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও হস্ত্যতা গড়ে ওঠে, তাঁরাও বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলেন না। স্বাধীনতার পৰ একটি

কবিতায় আকুল গনী হাজারী ভাই এই দৃঢ়ই প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের নীরবতা ছিল আমাদের দারণ কষ্টের কারণ।

আসলেই পাকিস্তানের জনগণ তখন আমাদের নির্যাতেন এতটুকু বিচলিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের আঠার বছর পর ভূট্টোনয়া প্রধানমন্ত্রী বেনজীর আজ মৃত্যুর সূরে বলছেন, সামরিক বাহিনী পরিচালিত সেই গণহত্যার পিছনে পক্ষিম পাকিস্তানের জন সমর্থন ছিল না। কিন্তু মন কি তা মানে? সত্য বড়ই নির্মম! কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন নন্দিত গণনায়ক বেনজীর-প্রিদেবে জুলফিকার আলী ভূট্টো স্বয়ং গণহত্যার নীল নকশার একজন নেপথ্য প্রধান স্থপতি। একাত্তর মধ্য ফেরুআরির কোনো একদিন ইসলামাবাদে পাঁচ ঘটা ব্যাপী এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত হয় নীল নকশা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, সামরিক প্রধানগণ এবং জুলফিকার আলী ভূট্টো। মূলতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির উদ্যোগেই আহত হয় এই সভা। তবুও সেই ব্যক্তিই যখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের চকাস্তে ফাসি কাঠে উঠলেন, তার সেই মর্মান্তিক পরিগতিতে গণতন্ত্র সচেতন বাঙালি যেমন ব্যথিত, তেমনি পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনৰ্প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার আত্মজার বিজয়ে এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ তেমনি উদ্দীপ্ত। এ ধরনের সহানুভূতি অথবা উদ্দীপনা নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয়। একাত্তরে আমাদের সংগ্রামে অথবা সংকটে পাকিস্তানের জনসমর্থন অথবা সহানুভূতি ছিল কি ছিল না, তা নিশ্চয়ই আমাদের নীতিবোধ ও আদর্শের নিয়ন্ত্রক হয়ে পাকিস্তানের মতো সকল দেশে গণতন্ত্রের মুক্তি আমাদের কাম্য। যদিও একাত্তরে পাকিস্তানের জনগণের এক ফেঁটা করণ্যাও আমাদের ভাগ্যে জ্বোটেনি।

একাত্তরে জুনের পর থেকেই পাকিস্তান দখলদার বাহিনী তাদের কৌশল পাল্টাতে শুরু করলো। বাংলাদেশের লক্ষলক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই সীমান্তের ওপারে। গণহত্যার কাহিনীও সারা পথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। ফাইদী নিধন, মাইলাই ঘটনা, ইতিহাসের সব কলঙ্কই বাংলাদেশে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের পাশে মুন। যে মাসের শেষে যে বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ঘুরে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়, তাদের ভ্রমণ সামরিক কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও তাদের কলমকে শেষ পর্যন্ত ঠিক নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। চারপাশ দেখেনুন উপলব্ধি ঠিকই কাজ করেছে। সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যাওয়া আমাদের তরুণ ছেলেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যখন তখন দেশের ভিতরে তাদের অনুভবেশ ও গেরিলা তৎপরতা পাক সেনাদের তয় ও দুশ্চিন্তার কারণ। দেশের অভ্যন্তরে পট পরিবর্তন লক্ষণীয়। পঁচিশে মার্চের পর গণহত্যার সূচনার মোনায়েম থান, সবুর থান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, গোলাম আজম প্রযুক্ত কতিপয় বিশিষ্ট দালালের উপরই ছিল পাক সেনাদের নির্ভরতা। কিন্তু জুলাই মাস নাগাদ এই রাজাকার আলবদর সংখ্যা বাইশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। মোট পঁচাত্তিশ হাজার মানুষ নিয়ে এই রাজাকার বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা। মুক্তিযোৱা ও স্বাধীনতার সক্রিয় সমর্থকদের চিহ্নিত করা, আটক করা ও হত্যা করাই ছিল রাজাকারের দায়িত্ব। ওই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আকুল হাই ফারম্বৰ্কী ও আজিজুল ইসলাম নামে দুই ছাত্রের নেতৃত্বে আল বদর বাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। কতিপয় শিক্ষকের আশীর্বদ পূর্ণ এই বাহিনী শুধুমাত্র

পথ প্রদক্ষিণ ও ইসলামী স্লোগানেই যে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেনি, পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষী। স্বদেশের শাটি ও মানুষের সাথে আলবদর রাজাকার আল শামসের জন্য বিশ্বসংযোগকর্তা ইতিহাসে বিরল। তিরিশটি রূপোর টাকার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ মনীয়দেরও তারা জবাই করেছে নির্বিধায়।

এইসব রাজাকার আলবদর শাষ্টি কামিটির মানুষজনকে দৃঢ়মৰে সহযোগী হিয়াবেঁ পাশে পেয়ে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর বেশ সুবিধা হলো। বর্ষা বাদলের দিনে নানা রকম ঝুঁকি নিয়ে গ্রামের এদিক ওদিক ছোটছুটি করার আর দরকার নেই। নিদিষ্ট খবর পাবার পরই সন্তোষে তারা কাজটি সম্পন্ন করে আসতে পারে অথবা রাজাকার বাহিনীর ঘারাই মুক্তিকামী মানুষের শেষ নিশ্চাস কেড়ে নিতে পারে। একেই বর্ষা বাদলে চলাফেরায় খানসেনারা অভ্যন্ত নয়, তার উপর সে বছর বৃষ্টির ধূমও তেমনি। ‘২২ শে জুলাই ঢাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাত ইঞ্চি –’ সংবাদপত্রে খবর হয়ে এলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন কোনো কোনো বছর একটানা বৃষ্টিবিহীন সন্তাপ পোহাতে হয়, মোটেই তেমন ছিলনা একত্র। আর অবিমাম বৃষ্টি নামলেই তাহা ভাই প্রায় ময়ুরের মত নাচতেন—‘শালারা কেমন জন্ম, বেরোতে পারছেন।’

পাক সেনাদের চরিত্র ও মূলনীতি কোনো কিছুরই পরিবর্তন হলো না, শুধু তাদের কৌশল একটু যোড় নিল মাত্র। তুরা জন পাকিস্তানের সব সংবাদপত্রে ফলাও করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩ জন শিক্ষকের বিবৃতি বেরোলো। তাঁরা বললেন, ‘পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি করেনি, সব ঠিক আছে, সব কিছু স্বাভাবিক।’ ডুগোল বিভাগের প্রফেসর প্যাটেল ও ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আহমদুল হক খান এই বিবৃতি রচনায় সাহায্য করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দেশের এমন অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর নাম ছিল, যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে কিংবা দেশত্যাগীদের কাছে এই বিবৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা হারালো। সবাই বুঝলো এই বিবৃতি বানোয়াট, স্বাক্ষর প্রধানকারীগণ বন্দী শিবিরে আটকে পড়া মানুষ। অবশ্য পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সমর্থক শিক্ষকের চোখে তখন সেনাবাহিনীর সবরকম দৃঢ়মই ‘সময়োচিত সঠিক কাজ’। এইসব মানুষের কাছে গণহত্যা ছিল জেহাদ, পাকিস্তান তথা ইসলাম রক্ষার জন্য অপরিহার্য। আইন বিভাগের জনৈক অধ্যাপক বেশ জোরেশোরেই বললেন, জেহাদ শুরু হয়ে গেছে, অতএব নরহত্যা জ্ঞায়েজ। হিন্দু, ইন্দু ভাবাপন্ন, নাস্তিক ক্যুনিন্স্ট এবং ভারতের আগ্রাসন ঠেকাতে হবে—এই ছিল তাদের স্লোগান। মে মাসের শেষে এমন দুর্জন দালাল শিক্ষকই বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে সাফাই সাক্ষী দেন। শুধু দালাল শিক্ষক কেন, তাদের কারো কারো স্ত্রী পর্যন্ত তখন স্বার্থজ্ঞ। শেনা যায়, এমন একজন স্ত্রী পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ‘ধর্মণ’ কর্মের সপক্ষে বলেন—‘উপায় কি, হাজার মাইল দূরে স্ত্রীদের ফেলে তারা দেশের জন্য লড়ছে।’

দালাল শিক্ষকেরা একদিকে দখলদার পাক সেনাদের তাবেদারী করতেন, আবার অন্যদিকে স্বজ্ঞনের প্রতি তাদের হস্তিত্ব কখনো কখনো সুস্থতাৰ সমন্বয় সীমা ছাড়িয়ে যেত। দালালীর গোৱাবে তাপিত বাণিজ্য বিভাগের এমন একজন অধ্যাপক একদিন তাঁর অগ্রজ্ঞ বহসী শবীর চৰ্চা বিভাগের এক উর্ধ্বরত্ন কর্মকর্তাকে বাড়ীতে ডেকে মুরগ-অযোগ্য

আচরণের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অপরাধ : অধ্যাপক ও কর্মকর্তার পুত্রদের ঝগড়া ও মারামারি। প্রোট কর্মকর্তা সুবিচারের আশায় গেলেন ভাইস চাম্পেলের ডঃ বুয়ারীর সমীক্ষে। তখনকার মতে বিবোধের মীমাংসাও নিশ্চয় করলেন ডঃ বারী। সেই কর্মকর্তা বহুদিন লোকান্তরিত। কিন্তু পিতৃ অপমানের সেই দার্শণ এখনো দগদগে তাঁর পুত্রদের বুকে।

স্বাধীনতার পরপরই অনেক দালাল শিক্ষক বাধ্যতামূলক ছুটিতে যান এবং কেউ কেউ কারাবন্দ হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুজিব সরকারের বদন্যতায় সকলের নিষ্কৃতি। ছোট একটি ভূখণ্ড বঙ্গলাদেশ। আভৌতার সহস্র বছনে পরম্পর গাঁথা। নানা রকম সম্পর্কের সূত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করতে এসে এই কপাই বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপাচার্য ভবনে সাঙ্গ প্রীতি বৈঠকে তরুণ অধ্যাপক আন্দুর রাঙ্গাক সরাসরি প্রশ্ন করলেন :

‘মুজিব ভাই, আপনি কি দালালদের মাফ করে দিয়েছেন?’

একটু হেসে বললেন বঙ্গবন্ধু :

‘কি করি কও তো? চাচা রাজাকার, ভাইপো মুক্তিযোৰ্জা। চাচাকে শাস্তি দিতে গেলে ভাইপো তার পিঠ দেখায়ে বলে মুক্তিযুজ্বলের জন্য সে কত অত্যাচার সহ্য করেছে। রাজাকার চাচার জন্য মুক্তিযোৰ্জা ভাইপো পায়ে পড়ে মাফ চায়, কি করি কও?’

আসলে মুক্তিযোৰ্জাদের মহানুভবতাই স্বাধীনতার পর দেশটাকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নেয়নি। শুধু কি তাই। স্বাধীনতার পর আমাদের মনোভাবও বদলে গেছে দ্রুত। আর পারম্পরিক বৈরিতা নয়, এমনই ছির আমাদের দৃষ্টিভঙ্গ। বাহ্যতর সালের প্রথম দিকে আমাদের পাশের ফ্লাটে সপরিবারে আশুয় নিলেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ ওয়াসিম ও ভাইস চাম্পেলের স্টেমো তৈয়ব আলী। দুজনেই অবাঙালি, দুজনেই বিরক্তে বড় বড় অভিযোগ। ডঃ ওয়াসিম শহরে লুট্টরাঙ্গে জড়িত, তৈয়ব সাহেব সরাসরি দখলদার বাহিনীর একেট হিশাবে কাজ করেছেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাইয়ুমকে পঁচিশে নভেম্বর রাত নটায় বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে সোজা জল্লাদের হাতে তুলে দেন এই তৈয়ব আলী। পরবর্তীকালে, তিরিশে ডিসেম্বর বোয়ালিয়া ক্লাবের কাছে পদ্মাৰ চৰে আরো চৌদ্দটি লাশের মধ্যে অধ্যাপক কাইয়ুমের মৃতদেহ ‘নাক্ত হয়।

অর্থ স্বাধীনতার পর ডঃ ওয়াসিম কিংবা ওই তৈয়ব আলী আমাদের পাশের ফ্লাটে অবস্থান কালে মানবিক কারণেই তাদের বিপদে আমার স্ত্রীকে কৃত্ব দাঢ়াতে হয়েছে—না, আর হত্যা নয়, আর রক্ত নয়। ডঃ ওয়াসিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন। বেশ নিরিষ্যে চলে গেলেন পাকিস্তানে। এখনও মাঝে মাঝে আমাকে চিঠিপত্র লেখেন। আর তৈয়ব আলী সাহেবও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরীকাল পূর্ণ করলেন। শুধু এই একজনই নন, এ দেশের মানুষ হত্যার বহু নায়কই আমাদের ক্ষমা পেয়েছে। তাঁরা বহুল তবিয়তে আছেন, শৈশ শৈশ তাদের উপ্রতি হচ্ছে এ দেশের যাচিতে। মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন তাঁরা। দালাল পুনর্বাসন এখন এক সরকারী কর্মসূচী।

একাত্তর ১২ই মে গণিত বিভাগের অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে আটক করে প্রথমে কিছুদিন জুবেরী ভবনে বন্দী রাখা হয়। পরবর্তীকালে ওই সময়ের অভিজ্ঞতা এক সাক্ষাৎকারে (পূর্বদেশ, ১৩ই মে ১৯৭২) বর্ণনা করেন অধ্যাপক রহমান ওরফে দেবদাস। তিনি বলেন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ডঃ মুহম্মদ আব্দুল বারী, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ মকবুল হোসেন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ মতিউর রহমান প্রায়ই যেতেন জুবেরী ভবনে অবস্থানরত সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে। এসব এমন কিছু নতুন তথ্য নয়। সেখানে তাঁদের কি কাজ ছিল, তা ও সর্বজনবিদিত। তাছাড়া ওই সময়ে জুবেরী ভবনের সামনে সকাল থেকে সঞ্চা পর্যন্ত যে দুটি বেসামরিক গাড়ী পার্ক করা থাকতো, তার একটির যালিক ডঃ মতিউর রহমান, আর অন্যটি এক বাঙালির। শরীফ সাহেব নামে এক ভুগ্রলোক তার যালিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকার স্বামী তিনি। সামরিক সদর দফতরে এত কি কাজ ছিল তাঁদের?

একাত্তর সালের জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলতে থাকলো। চাকুরীচ্ছত হবার আশঙ্কায় অনেক শিক্ষক কাজে যোগদান করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি চলতে চলতে প্রশাসনের কিছু রদবদল হয়ে গেল। ১৭ই জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাসেলর নিযুক্ত হলেন ডঃ মুহম্মদ আব্দুল বারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাসেলর নিযুক্ত হলেন ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াফেন এবং যয়মনসিংহ কংগি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাসেলর নিযুক্ত হলেন ডঃ আমিরুল ইসলাম।

ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ডঃ মুহম্মদ আব্দুল বারীর পৌত্রাগ্য তারকা যে উদ্দিত হচ্ছে, তা অনুমান করা অবশ্য কঠিন ছিল না। এই নতুন নিয়োগ ঘোষণার কদিন আগেই একটি ঘটনায় তার আভাস মেলে। সেদিন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিবুল হোসেনের গাড়ীতে চড়ে আমার শিক্ষক ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আমানুল্লাহ আহমদ ও আমি শহরে কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ক্যাম্পাসে ফিরতেই দেখি জুবেরী ভবনের মাঠে হেলিকপ্টার এবং পথে পথে তিন হাত অন্তর সশস্ত্র জওয়ান। আমরা অবাক। কেননা শহরে যাবার আগেও পাকসনাদের চলাফেরায় তেমন চাঁঞ্চল্য সেদিন আমরা লক্ষ্য করিনি। তবে এই বিশেষ নিরাপত্তা কেন? জুবেরী ভবনের কাছে আসতেই আমাদের গাড়ী থামানো হলো। প্রশাসন ভবনের দিকে যাবার হ্রক্ষম নেই। রাস্তার পাশে গাড়ী পার্ক করে হাসিব ভাই ও আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। এমন সময় এক জওয়ান এসে জিজ্ঞেস করলো :

‘কেয়া আপ লোগ অফসের হ্যায়?’

আমরা ধাঢ় নাড়লাম। প্রফেসর ও অফিসার ওদের কাছে একই ব্যাপার—অফসের। ‘অফসের শুনেই জওয়ানটি ব্যস্ত হয়ে উঠলো :

‘তব জাইয়ে, জাইয়ে, জর্গাল সাব তো আপকে সাথ মূলাকাঁ করণে আঁয়ে।

কোন জেনারেল এলেন ভাবতে আমরা প্রশ়াসন ভবনে গিয়েই শুনি, টিক্কা খান উপরে রেজিস্ট্রারের ঘরে। প্রশ়াসন ভবনের গেটে ঢকেই বাঁ দিকে আমার দফতর। সেখানে আমরা তিনজন প্রতীক্ষাতর। টিক্কা খান সত্ত্ব সত্ত্ব মানুষ কিনা অর্থাৎ এই নামে কোনো মানুষের অস্তিত্ব আছে কিনা, এ নিয়ে বরাবর আমার দারুণ সংশয়। প্রথমতঃ কোনো ভদ্রলোকের নাম এমন খিচিটি হতেই পারে না, দ্বিতীয়তঃ যে মানুষ লক্ষ লক্ষ হত্যা ও ধর্ষণের পরও অবিচল কষ্টে বলতে পারে যে এ দেশের মানুষ চাইনা, শুধু মাতি চাই—'স্বেচ্ছ মিট্টি চাহিয়ে, আদমী নেহি— সে মানুষ অবশ্যই অন্য কোনো প্রাণী, মানুষ নয়। তাই টিক্কা খান তখন আমার কল্পনায় প্রকাণ্ড এক দৈত্য দানব অথবা হিস্তি জানোয়ার।

একটু পরেই সিডি দিয়ে নামলেন টিক্কা খান ও তার কক্ষন সঙ্গী। রেজিস্ট্রার আব্দুর রহিম জোয়ার্দার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদ তাঁর দু পাশে। আমার অফিস কক্ষের পূর্ব দিকের দরজার পর্দা উঠু করতেই বেশ কঞ্জোড়া চোখ ঝট্ট করে আমার উপর এসে পড়লো। টিক্কা খান কয়েক হাত দূরে। একটি মুহূর্ত মাত্র। রুক্ষ আমার নিষ্পাস। মনে হলো, একজন বীরের মতো জীবনটাকে উড়িয়ে দেবার সাহস যদি আমার থাকতো, তাহলে এক্ষণি বঙ্গলাদেশের গগহত্যার মহা নায়কের জীবন নাশ করে শতক্ষীর প্রতিশোধ নিতাম, ইতিহাসের পাতায় মৃত্যি হয়ে যেত আঞ্জকের দিন। কিন্তু সবই কল্পনা বিলাস, দুর্বল ভীরুক অক্ষম মানুষের দিবাবৃপ্তি।

টিক্কা খান গাড়ীতে উঠলেন, পাশে রেজিস্ট্রার। হাস্তির ডাই সিডিতে দাঙিয়ে তাঁর হাত দুটি পিছনে রেখে বেশ কেতা দুরস্তভাবে একটু ঝুকে জেনারেল টিক্কার চেহারা দেখতে লাগলেন। শব্দ উড়িয়ে চলে গেল গাড়ী। আমার্দের দম ছাড়া পেল।

জেনারেল টিক্কা কেন এলেন, কেন এত তড়িতড়ি গেলেন প্রথমে কিছুই জানতাম না। পরবর্তীকালে কিছু মুখোচক কথা মুখে-মুখে ফিরতে লাগলো। যেমন, টিক্কা খান বিনা নোটিশে আচমকাই রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকে পড়ে নাকি বলেছিলেন—

'I am Tikka Khan. Where is your senior professor? I want to meet him.'

তখন রেজিস্ট্রার কি হালে ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর পরিধান বস্ত্র কে জানে। তবে সিনিয়র প্রফেসর বলতে যে ডঃ বারীকে বোঝানো হচ্ছে, তা ঠিক অনুমান করতে তাঁর বেশী সময় লাগেনি। ডঃ বারীকে খবর দেবার জন্য ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে হকুম দিলেন রেজিস্ট্রার। ডেপুটি রেজিস্ট্রার এতবড় দায়িত্ব আগে কখনো পাননি। এমনিতেই সব কাজেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েন, ছটফট করেন। আর এই হকুমের মূল উৎস টিক্কা খান। প্রায় বেসামাল অবস্থা তাঁর। মহা জোশেই পেয়াদাকে হকুম দিলেন তিনি :

'মাও ডঃ বারী কো আনে বোলো!'

জনশুভ্রতাঃ পেয়াদ হকুম বরদারের মতোই বাক্যটি যথাস্থানে পোছে দেয়। রীতিমত বেয়াদপি আর কি। তারপর ডঃ বারী যখন জানলেন, তলব ডেপুটি রেজিস্ট্রারের নয়, খোদ টিক্কা খান তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্তী, তখন ছুটতে ছুটতে এলেন তিনি এবং শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টার ওড়ার কিছু আগে পূর্ণ হলো টিক্কা খানের খায়েশ। আমাদের কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে ডঃ বারীর সৌভাগ্য তারকা এখন মধ্য গগনে। নিচয়ই তিনি কিছু একটা হচ্ছেন। আর তিনি হলেনও তাঁ— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম ভাইস চাম্পেলর।

ଟିକ୍କା ଥାନ ଏଲେଇ ବା କି । ଆମରା ତତ୍ତ୍ଵଦିନେ ଟେନଶନ ପ୍ରକଟ । ଆଗେ ଯେମନ ମର୍ଟ୍‌ର କାମାନେର ଶବ୍ଦେ ଘରେର ମେଘୋତେ ଢାଳାଓ ବିଛାନା କରେ ଡଃ ଜ୍ବବାର ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମରା ସବାଇ ଏକସାଥେ ଘୁମିଯେ ନା ଘୁମିଯେଇ ରାତରେ ପର ରାତ କାଟିଯେ ଦିଯେଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେୟେ । ଡଃ ଜ୍ବବାର ଚଲେ ଗେଛେନ ତାର ଫ୍ଲାଟ୍ । ଆମାଦେର ଦଲାନେଓ ଗଣିତ ବିଭାଗେ ଡଃ ଶରୀଫ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗେର ଅଧ୍ୟାପକ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ତାଦେର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫିରେ ଏସେହେନ । ଆମାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଶ୍ୟାଲିକା ସବାହିକେ ଆମିଓ ଏକ ସୁଯୋଗେ ଢାକାଯ ଶୁଶ୍ରାବ ବାଡ଼ିତେ ମେଥେ ଏଲାମ । କେନନା ବନ୍ଦୀ ଶିବିରେ ଧାଚାବନ୍ଦୀ ମୁରଗୀର ଜୀବନ ଯାପନେ ଓରା ତଥନ ଇପିଯେ ଉଠେଛେ । ତାଇ ଢାକାର ଜନାରଣ୍ୟେ ଓଦେର ଡିଡ଼ିଯେ ଦିଲେ ନିରାପତ୍ତାର ନିଶ୍ଚଯତା ଅନେକ ବେଶୀ । ନିରାପତ୍ତା ଯେ ଅନେକ ବେଶୀ ନିଶ୍ଚିତ, ତା ଢାକାଯ ଗିଯେଇ ଟେର ପାଓୟା ଗେଲ । ବଞ୍ଚୁ ଅଭିନେତା ମୁନ୍ତାଫର ମାଥେ ଦେଖା । ବିକ୍ଷୁଳ ଶିଳ୍ପୀ ସମାଜେର ନେତ୍ରତ୍ତାନୀୟ ସଂକଳିତ ତିନି । ଚିହ୍ନିତ ମାନ୍ୟ, ପର୍ଦାର ମୁଖ, ଚଳାଫେରା ଦାୟ, ସବାଇ ତାକେ ଚେନେ । ତବୁଓ ଢାକାଯ ଡିଡ଼େ ମିଶେ ଆହେନ ଦିବିୟ । ତିନି ବଲଲେନ, ରାଜଶାହୀ ସୀମାନ୍ତ ପଥେ ଯଦି ଓପାରେ ନିର୍ବିନ୍ଦ୍ୟ ଯାଓୟା ସମ୍ଭବ ହୟ, ତାହଲେ ଓକେ ଯେନ ଖବର ଦିଇ । କିନ୍ତୁ ତଥନ ସମସ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ପଥର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ ସୀଲିଙ୍କ । ଓପାରେ ଯାଓୟା ତଥନ ଆମାଦେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ।

ସୀମାନ୍ତର ଓପାରେ ଯାଓୟା ଯେମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଚଳାଚଳିଓ ତେମନି ତଥନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟପ୍ରେର ଅଭିଜ୍ଞତା । ରାଜଶାହୀ-ଢାକା-ରାଜଶାହୀ ପଥେ ପଥେଇ ଚେକପୋସ୍ଟ । ଶାର୍ଟ ପ୍ଲାଟେର ପକେଟ ବ୍ୟାଗ ସୁଟକେସ ଗାଡ଼ିର ବୁଟ ସବ କିଛିରଇ ସାର୍ଟ ରାଜଶାହୀ । ଫେରାର ପଥେ ବାରବାର ସାର୍ଟରେ ଧକଲେ ପାବନା ପୌଛତେଇ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ । ଗାଡ଼ିର କର୍ତ୍ତା କୁଟୁମ୍ବ କୁଟିର ଶିଳ୍ପ ସଂହାର ମୁଗ୍ଗ ପରିଚାଳକ ବଞ୍ଚୁ ମସିହଟିର ରହମାନ ବଲଲେନ, ରାତେ ପାବନା-ରାଜଶାହୀର ପଥ ଆରୋ ଥୁକିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଇ ପାବନାର ତୃଣ ନିଲଯେ ରାତ କାଟିଲାମ ଆମରା ଏହି ହେଟେଲେର କିଛୁ ଦୂରେ ପାକସେନାଦେର ମାଥେ କିଛୁ ବାଙ୍ଗଲି ତରଣେର ହସିଠାଟ୍ଟା ଇମାରି ମଶକରା ନଜରେ ଏଲୋ । ଏକାତ୍ମରେ, ଏମନ ଦଶ୍ୟ କଳ୍ପନାତୀତ । ସେଥାନେ ଓଦେର ଟାଙ୍ଗେଟ୍ ବାଙ୍ଗଲି ତରଣେରା ବନେ ଜଙ୍ଗଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗଡ଼ିଛେ, ମେଥାନେ ପାକସେନାଦେର ସେହପୂଟ୍ ଏହି ତରଣେରା କାରା ।

ଢାକା ଥେକେ ଫିରେ ଆମାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଆମି ଏକା । ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲେର ସେଇ ନିର୍ଜନତା ନେଇ । ତବୁଓ ମଙ୍ଗ୍ୟ ହଲେଇ କେମନ ଗା ଛମହ୍ୟ କରେ । ତାଇ ପାଶେର ଦଲାନେର ହିସାବ ବିଭାଗେର ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଲାମ ହେସେନେ ଛୋଟୋ ଭାଇ ମେଡିକିକାଲ କଲେଜେର ଛାତ୍ର ନୁରଜଜାମାନ ଆମାର ସାହସ ଜୋଗାତେ ପ୍ରାୟଇ ଆମାର ଫ୍ଲାଟ୍ ରାତ କାଟାଯ । ଗୋଲାମ ହେସେନ ପରିବାରଓ ଯେ ଭାରତ ଫେରତ ଏ କଥା ତଥନ କେଉଁ ଜାନନ୍ତେ ନା । ଏହି ପରିବାରର ମାଥେ ଆମାର ହଦ୍ୟତା ଭ୍ରିତ ବୁଜିର ଫଳ ଦ୍ବୀପାଳୀ ଏହି ଯେ ପ୍ରାୟଇ ଆହାରେର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନେନ ଗୋଲାମ ହେସେନ ସାହେବ । ଆମି ଏକା, ଅତ୍ୟଏବ ଆମାର ଭାଲୋମନ୍ଦ ଦେଖାଯ ତେପର ହଲେନ ତିନି ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ।

ସାରାରାତ ଗୋଲାଗୁଲି ଚଲୁକ ଆର ଯାଇ ହେକ ଆମରା ନିଶ୍ଚିତ୍, ଟେନଶନେ ଥାତସ୍ତ । ଓଇ ଦୃଷ୍ଟପ୍ରେର କତ ମଜାର କାଣ ଯେ କରେଇ । ଏକ ସମୟେ ପାଶେର ଫ୍ଲାଟ୍ ଥାକାନ୍ତେ ଏଷ୍ଟେଟ ଅଫିସର ଲୋକମାନ ଆଲୀ । ଏକ ବ୍ୟାଣେର ଏକଟି ଛୋଟ ଟ୍ରାନସିସ୍ଟର ଛିଲ ତାର । ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ମଙ୍ଗ୍ୟର ପର ତାହ ଭାଇ ପାଶେର ଫ୍ଲାଟ୍ ବେଡାତେ ଏସେ ସେଇ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରି କାନେ ଚେପେ ଥୁବ ଲୋ ଭଲୁମେ ସ୍ଥାଧିନ ବାଲ୍ଲା ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶେଷ କରେ ଚରମପତ୍ର ଶୁନଦେନ । ଶବ୍ଦ ଏକଟୁ ଜୋରେ ଉଠେଇ ଆଶେ ପାଶେର ଟହଲଦାର ଜ୍ବଯାନେରା ବୁଝେ ଫେଲତେ ପାରେ, ତାଇ ଏତ ସାବଧାନତା । କେନନା ଚରମପତ୍ରେର ଭାସ୍ୟକାର ଏମ, ଆର, ଆଖତାର ମୁକୁଲେର ବାଚନଭଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ

প্রক্ষেপণ তখন দারুণ পরিচিত, দূর থেকে একটু শুনলেই বোঝা যায়। কোনো একদিন দরজা জানালা বক্ষ করে তাহা ভাই যখন এই অবেধ শুবাখে মগ্ন, আমি ওই ফুটের দরজায় কড়া নেড়ে খুব তারী গলায় বললাম : ‘দরওয়াজা খুলিয়ে, অন্দরমে কোন হ্যায়?’ তাহা ভাই এই না শুন এমন ঘাবড়ে গেলেন যে রেডিও নব যেদিকে ঘূরিয়ে বক্ষ করতে হয়, তার উল্টো ঘূরিয়ে শব্দকে প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিলেন। তারপর যখন দরজা খোলা হলো, দেখি তাহা ভাই ও লোকমান সাহেবে দৃঢ়নেই প্রায় ভয়ে বিবর্ণ।

এ রকম ঠাট্টা এটাই প্রমাণ করতো, বাইরে আমরা যতই স্বাভাবিকতার মুখোশ এঁটে থাকি না কেন, আসলেই প্রতি মুহূর্ত আমাদের কাটতো দারুণ টেনশন। আমাদের ভয়ভীতি ঘৃণা ক্রেতে সবই আমরা চেপে রাখতাম একটা ‘ভালোই আছি’ আবরণের আড়াল। আমি নিজেই একটু বেশি ভীতু ছিলাম বলেই হয়তো অন্যকে ভয় পাইয়ে মজা দেখাব দৃঢ়ুমি দুঃএকবার আমাকে পেয়েছে। কেন যে এমন করতাম, জানি না। হয়তো ওটাও এক ধরনের টেনশন রিলিফ। যেমন একবার সহকারী রেজিস্ট্রার আ. ফ. ম. শহিদুল্লাহ সাথে এমনই নিষ্ঠুর ঠাট্টা করে বসলাম, পরে আমারই অনুশোচনা হয়েছে মনে মনে। ঘটনাটি এই রকম :

ডঃ বারী ভাইস চাম্পেল নিযুক্ত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় অফিসারগণ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন প্রশাসন ভবনের তথনকার কাউন্সিল রুমে। এই অনুষ্ঠানে সহকারী রেজিস্ট্রার তাঁর আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগ বিহ্বল কঠে বললেন : ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়রের ওতো নাচেরে।’ পরদিন অফিসে গিয়ে আমার মনে হলো এই উৎ্খনিতির সূত্র ধরে শহিদুল্লাহ সাহেবকে একটু ব্যস্ত করে তুলি। অতএব টেলিফোন তুলে খুব গম্ভীর স্বরে একটু মিলিটারী কায়দায়, যেমনটি আশে পাশে শুনতাম আর কি, বললাম :

Captain Yakub speaking. Are you Mr. Shahidullah?

Yes Sir. Yes Sir. অনেকবার বললেন আমার সহকর্মী।

Did you speak at the reception yesterday?

Yes Sir. Yes Sir. গদগদ হয়ে পড়লেন আমার বক্সু।

What did you speak at the reception?

শহিদুল্লাহ সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। কী উত্তর দেবেন পেলেন না। আমি আবার বললাম
ঃ

Didn't you quote from Tagore at the reception?

Yes Sir. No Sir. Yes Sir.

কথার খিচড়ি পাকিয়ে ফেললেন সরল বিশ্বাসী মানুষটি।

আমি বেশ শাস্ত দৃঢ় কঠে বললাম :

‘Don't you know Tagore is not our poet?’

‘Yes Sir. I know Sir.’

‘Tagore is our enemy.’

'Yes Sir, Tagore is our enemy.'

'Then, who is our poet?'

ভীত সন্তুষ্ট মানুষটিকে আমি প্রশ্ন করলাম। ধার্থায় পড়লেন আমার সহকর্মী, বজ্জ ঘাবড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন :

'Who, who is our poet Sir?'

এবার একটু জ্ঞারেই ধমক ঝাড়লাম আমি।

'You don't know that? Iqbal. Iqbal is our poet. Iqbal- will you remember it?'

টেলিফোনের অপর প্রাণে সহকর্মীর ভয়ার্ট কঠিনরে আমিই ভয় পেলাম, কি জানি দুর্দলোক শেষে অজ্ঞান না হয়ে যান। তৎক্ষণাৎ হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। দোতলা থেকে ছুত নেমে এলেন শহিদুল্লাহ সাহেব। ঘামহেন। আমাকে বললেন : 'এমন ঠাণ্টা এ সময়ে কেউ করে?' তাঁকে দেখে আমার মায়া হলো। আন্তরিক ভাবে আমি ক্ষমা চাইলাম।

অগ্স্ট থেকে ব্লাস শুরু। ছাত্রছাত্রীরা ফিরবে ক্যাম্পাসে। অতএব পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে সারা ক্যাম্পাস জুড়ে এমন ছাড়িয়ে থাকা আর চলে না। আমাদের সামনের ৮ নং দালান, জুবেরী ভবন, কলা ভবন, বিজ্ঞানভবন এবং জিম্মাহ হল ফাঁকা করে গেল পাকসেনারা। জোহু হল এবং তার আশেপাশেই পাকসেনাদের তখন বসবাস। প্রাথ্যক্ষ ভবনগুলি কর্ণেল ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের দখলে। পশ্চিম পাড়ায় জওয়ানদের টহল ও তৎপরতা করে এলো। মনুজান ভুলের দক্ষিণ মাঠে ওয়াজিউল্লাহর দোকানের পাশে সারি সারি সাজানো ভারী কামাক্খি অন্যান্য অস্ত্রসংস্কারও সরে গেল ক্যাম্পাসের উত্তর-পূর্ব এলাকায়।

আমরা ভেবেছিলাম, দু'একজন দালাল ছাত্র যদিও বা আসে, ছাত্রীরা কেউ নিশ্চয়ই আসবে না। আসলে আমরা ঠিক অনুমান করতে পারিনি দেশের অভ্যন্তরে কী ঘটছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা তখন শুরু হয়ে গেছে। তার ফলে কোনো কোনো এলাকায় পাকসেনারা নানাভাবে বিপদ্ধস্ত কিংবা বাধ্যগ্রস্ত। আর যে যে এলাকায় তাদের এই বিপত্তি ঘটছে, তার আশেপাশের শহরগ্রামের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পাকসেনারা ঢুকে অল্প বয়সী তরুণ ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে খুব সন্তর্পণে। এই কাজে তাদের দৃষ্টিদান করছে আল বদর-রাজাকার-আল শামস ও শাস্তি কমিটির মানুষ। তাই দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিচার করলে ওই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়। সেখানে অন্ততঃ বার্তাবিক জীবন যাত্রার একটি মুখোশ তৈরী করে পাকসেনারা সারা বিশ্বে দেখাতে চাচ্ছে— 'সব ঠিক হ্যায়।' অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও যে ছাত্রীদের জন্য কোনো নিরাপদ স্থান নয়, পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে ১৯ নভেম্বর রাতের মর্যাদিক গণ ধর্ষণ ও লুঠতরাজ তা প্রমাণ করলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বগলেই পদ্মতিক ও গোলামদাজ বাহিনী এবং তার পাশেই বধ্যভূমি। তা সত্ত্বেও প্রথমে দশ বারো জন ছাত্রী এলো। হ্যত তারা যেখানে ছিল, সে স্থানটি আরো বেশী বিপজ্জনক অথবা হয়তো তারা বেতার প্রচারে আমার

মতোই বিভাস্তি। কি জনি কেন তারা এত ঝুকি নিয়ে এলো।

মনুজান হল তখন বসবাসের অযোগ্য। মাত্র জন পনের ছাত্রী অত বড় হলে ওই সময়ে থাকবে কেমন করে। তাই তাদের সাময়িক অবস্থানের ব্যবস্থা হলো আমারই পাশের ফ্লাট। ভাইস চ্যাস্পেলর ডঃ বারী একবার সরেজমিনে দেখেও গেলেন সব রকম ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কিনা। আশপাশটা তখন একটু নিরূপদ্রব। জুবেরী ভবনে সামরিক সদর দফতর নেই। কাজলা গেট ও দু একটি বিশেষ স্থানে সশস্ত্র সেন্ট্রি থাকলেও কাছাকাছি কোথাও জওয়ানদের চলাফেরা নেই।

দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোশ রচনায় ওঠে পড়ে লাগলো সামরিক সরকার এবং গণমাধ্যমে সেই সত্যিমিত্যে মেশানো ত্রিতীর উপহাসনা চললো অবিবাধ। এই সময়ে ভাইস চ্যাস্পেলর ডঃ বারী একদিন ডাকলেন আমাকে। ‘বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক’ এই মর্মে স্থানীয় বেতারে কিছু প্রচার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিসার হ্বার কারণে এমন দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও সবিনয়ে আমি নিবেদন করলাম যে বেতার সম্প্রচার কাজে আমার তেমন দক্ষতা নেই। ভাইস চ্যাস্পেলরের দুজন উপদেষ্টা পাশেই ছিলেন, বললেন : ‘কেন, আমরা যে শুনেছি দীর্ঘদিন ধরে আপনি বৃত্তকাস্টিৎ এর সাথে জড়িত।’ আমি তখন এ দায়িত্ব এড়াতে মরিয়া। বললাম : দীর্ঘদিন জড়িত ঠিকই, তবে আমার অনুষ্ঠান ত্রৈয়েমন উন্নতযানের হবে না। যদি সাধারণভাবে শ্রোতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তাহলে বাঞ্ছলা বিভাগের কেনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই এ তার দেওয়া উচিত।’ ডঃ বারী আর পীড়াপীড়ি করলেন না আমাকে। সম্ভবত এই দায়িত্ব বাঞ্ছলা বিভাগের বক্তৃ প্রয়োগক শেখ আতাউর রহমানের উপর শেষ পর্যন্ত পড়ে এবং স্বাধীনতার পর এই কারণে তার কিছু ভোগাস্তিও হয়।

রেডিও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অমুক খুবই সতর্ক ছিলাম। কেননা রেডিওতে অর্ধসত্ত্ব প্রচার ডাহ যথ্যায় চেয়েও ত্বরকর। দেশে বিদেশে সেই প্রচার বিভাস্তি আনতে পারে, এ বেধ ছিল আমার টনটন। অথচ রেডিও থেকে রেহাই পাওয়াও সহজ ছিল না। রাজশাহী আসার পর আর্থিক অসুবিধা ঘোচাতেই রেডিওর সাথে যোগাযোগ একটু বেশী হয়ে পড়ে। প্রায় সব রকম অনুষ্ঠানেই আমার ডাক ছিল। এ বিষয়টি আর কেউ না জানুক, স্থানীয় বেতার কর্তৃপক্ষ ভালোই জানতেন। কিন্তু ভাগ্যজ্ঞমে ওই সময়ে আমার বিশিষ্ট বক্তৃ গোলাম রাখানী খান রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সত্যি বলতে তার সাহায্য ব্যতিরেকে রেডিও থেকে আমার রেহাই সম্ভব ছিল না। একদিন রাখানী সাহেবে বললেন :

‘বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আপনার নাম বারবার প্রস্তাবিত হচ্ছে। কিন্তু আমি চাইনা এইসব প্রচার মূলক অনুষ্ঠানে আপনি অংশ নেন। কে জানে ভবিষ্যতে এসব অনুষ্ঠান আপনার বিপদ ডেকে আনবে কিনা।’

বক্তৃকে ধন্যবাদ জানালাম আমি। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। রাখানী সাহেবে আবার বললেন :

‘তবে আমার কুলও একটু রক্ষা করা চাই। আপনি দুএকটি মায়ুলি ইনোসেন্ট প্রোগ্রাম করুন।’

‘যেমন?’

‘যেমন শিশুদের আসরের জন্য ভাস্কে দ্য গামার অভিযান।’

আমি তৎক্ষণাত সম্মতি জানালামঃ ‘ঠিক আছে।’

‘সবকুচ ঠিক হ্যায়’ দেশের এই চেহারা দেখাবার জন্য সামরিক সরকার তখন বড়ই ব্যাকুল। হিন্দুদের প্রতি পাকসেনাদের প্রকাশ্য আচরণও তাই বদলে গেল রাতারাতি। এই সময়ে আবার একদিন আমার ডাক পড়লো ভাইস চ্যাম্পেলর সমীপে। কি ব্যাপার! একটি হিন্দু ছাত্র ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হিন্দু ছাত্র ফেরা মানে পাকিস্তানের হাতে তুরুপের তাস। অর্থাৎ এই কুমীরের বাচ্চাটি পৃথিবীকে বারবার দেখিয়ে পাকিস্তান বলবে—দ্যাখো, দ্যাখো সব কিছু স্বাভাবিক কিনা, দ্যাখো, সকল ধর্মের সকল মানুষ এখানে গলাগলি লদকালদকি করে পরমানন্দে আছে কিনা।

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আহমদুল হক খান সেই হিন্দু ছাত্রটিকে নিয়ে ভাইস চ্যাম্পেলের ভবনে এলেন। সকলের মে কি উৎসাহ, যেন আকাশের ঠাঁদ হাতে ঝপ করে এসে পড়েছে। অধ্যাপক খানের মুখে সোনা গেল, একটি হিন্দু ছাত্র ফিরে আসায় কর্ণেল সাহেব নাকি দাকুণ খুলী, তার পারসোনাল গেস্ট হিশাবে ছাত্রটিকে তাঁর বাসায় (লতিফ হলের প্রাথমিক ভবন) তিনি রাখতে আগ্রহী। এই আমন্ত্রণের ফলে অবশ্য হিন্দু ছাত্রটির হাদ কম্পন আরো বেড়ে গেল। সে তো জানো, তখন একটি জ্যান্ত হিন্দুর বাচ্চা পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর কাছে কত মূল্যবান। তখন যে জানো একজন হিন্দুর সাটিফিকেট চাই যে হিন্দুরা এদেশে পরম সুখে এবং আহলাদিকালাতিপাত করছেন। আর তাই মধ্য এপ্রিলে নিহত অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাজবৈকল্প পত্নী ও পুত্রকন্যাকে ভালো রাখতে দখলদার বাহিনী ও তার বশব্দে দালালদের একটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঢ়ালো। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এইটুকু ভালো কাজ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর কারো কারো রক্ষা করচ হিশাবে কাজ করে।

আমার প্রতি নির্দেশ ছিল, ওই হিন্দু ছাত্রটিকে নিয়ে তক্ষুণি বেতার কেন্দ্রে যেতে হবে এবং সেখানে কোনো একজন রেডিও কর্মকর্তাকে দিয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করাতে হবে। ভাইস চ্যাম্পেলের উপদেষ্টা শিক্ষকেরা হিন্দু ছাত্রটিকে ব্রিফিং করলেন রেডিও সাক্ষাৎকারে কী বলতে হবে না হবে। প্রায় পাঁচ পড়ালোর ঘরতো ছিল সেই ব্রিফিং।

সেই হিন্দু ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম রেডিও স্টেশনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে দুজনে বসলাম পাশাপাশি। ছাত্রটি চুপচাপ জ্ঞানালোর বাহিরে তাকিয়ে আছে। তার মুখে কোনো কথা নেই। একটু একটু করে আমি ওর মনের সত্ত্বিকার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি, একটু একটু নিশ্চিত হতে চেষ্টা করি ও সত্ত্বিই হিন্দু কিনা। একবার পোড় খেয়েছি, অতএব চোখ কান খুলেই চলতে হচ্ছে আমাকে। কোনো ট্র্যাপে পা দেওয়া চলবে না। যখন ছাত্রটির হিন্দুত্ব সম্পর্কে আমার বিনুমাত্র সন্দেহ রইলো না, তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ

‘গাধা নাকি তুমি?’

ছাত্রটি আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি অবার বললামঃ

‘গাধার মতো ক্যাম্পাসে ফিরলে কেন? জানো না এটা এখন ক্যান্টনমেন্ট?’

‘জানি।’

‘তবে?’

‘আমি ফিরতে চাইনি,’

‘ফিরতে চাওনি মানে?’ আমার কৌতুহল বেড়ে গেল।

‘আসলে আমরা সময় মতো দেশ ছেড়ে যেতে পারিনি। কদিন আগে নৌকায় পাড়ি দিতে গিয়ে মাঝ পথে হঠাৎ ধরা পড়ি।’

‘তারপর?’

‘তারপর ওদের বললাম, আমরা ভারত থেকে ফিরছি, ওখানে বড় কষ্ট, কত লোক ক্যাম্পে ক্যাম্পে কলেরায় মরছে, তাই চলে এসেছি। কেন জানিনা ওরা আমাদের কিছু বললো না। বরং আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জানতে পেরে আমাকে এখানে আসার ব্যবস্থা করে দিল।’

এই হলো একটি হিন্দু ছাত্র ক্যাম্পাসে ফেরার সত্য ইতিহাস। হায়রে। ওকে বললাম :

‘কি আর করবে, তোমার দুর্ভাগ্য, এখন রেডিওতে ওই শেখানো কথা না বলে তো তোমার মেহাই নেই।’

‘জানি।’ ছাত্রটি মাথা নাড়লো।

রেডিও স্টেশনের গেটে ওকে নিয়ে বাস থেকে নামলাম। সশস্ত্র সেন্ট্রি গেটে। সেই জওয়ান আমাদের সর্বাঙ্গ বেশ ভালো করে টিপে টিপে দেখলো কোনো বোমাটোমা আছে কিনা আমাদের অস্তর্বাসে। আহা আমাদের কি মর্যাদা কি অভ্যর্থনা !

দেশের স্বাভাবিক চেহারা একটুখানি ফের্জীয়ার জন্য সামরিক সরকার তখন কত কাণ্ড না করছে। এক পর্যায়ে (তো সেটেব্রে) অর্থৰ ডগুন্ডাস্থ ডঃ মালিককে বসানো হলো গভর্ণর পদে। সামরিক সরকারের জুখ একটি বেসামরিক বোরখা খুলিয়ে দেবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন মোনায়েন খান, সবুর খান, ফকা চৌধুরী প্রমুখ বাঙলাদেশের ‘সুস্থানগণ।’

দেশটা বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই চলছে এই ব্যাপারটি নানা ভাবে নানা মাধ্যমে ফলাও করায় কিছু ফলও পাওয়া গেল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাঢ়তে লাগলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা চাঞ্চল হতেই আমার পাশের ফ্লাট ছেড়ে ছাত্রীরা যন্মজান হলে উঠে গেল। নিরুদ্ধিগ্রস্ত শহরের জীবনযাত্রা। কেটকচারী অফিস আদালত হাটবাজার যানবাহন চলছে। দিনের বেলায় দখলদার জওয়ানেরা যথারীতি টহল দেয় বটে, কিন্তু তাদের প্রকাশ্য উৎপাত কর। অথচ ওই একই সময়ে সীমান্তে ছোটো ছোটো সংবর্ধ চলছে। দেশের অভ্যন্তরেও মুক্তিবাহিনীর গৈরিলা তৎপরতা। এখানে ওখানে কালভার্ট উঠছে। দায়েল হচ্ছে পাকসেনা। ঢাকা শহরে বোমাবাজির ধূম। তটসু সেনাবাহিনী। স্টেট ব্যাংক ভবনে, টেলিভিশন কেন্দ্রে (ডি. আই. টি. ভবন), হোটেল ইন্টার কনের টয়লেটে, মন্ত্রীর গাড়ীতে, অভিজ্ঞাত বিপণী কেন্দ্রে যেখানে সেখানে বোমা ফাটছে। ২৩শে অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুরে গুলিতে দিনের বেলায় স্বগ্রহে নিহত হলেন প্রাচন গভর্ণর আবদুল মোনায়েন খান। দেশের যে সব স্থানে এবং শহরে শহরে যে সব এলাকায় মুক্তিবাহিনী আশ্রয় পাচ্ছে, সেখানেই দিনের আলোয় চলে

পাকসেনার অপারেশন। রাতের টহলে তখন ওয়া থুব সাবধানী। রাজধানীর কতকগুলি অঞ্চল তো ওদের জন্য তখন বড়ই খতরনক। দেশের সর্বত্র সরকারী দালানে দালানে সেন্ট্রি প্রহরা তখন জোরদার করা হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুঠোশ যতই লেপা যোঁছ হোক না কেন, ক্যাম্পাসের উত্তর-পূর্ব এলাকায় পাক দখলদার পদাতিক বাহিনীর অবস্থান এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবাই সচেতন। তখন একদিকে ঘেরণ মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম বৃক্ষ পাছে, অন্যদিকে তেমনি দখলদার বাহিনীর ছত্রছায়ায় ও আনুকূল্যে সংগঠিত হচ্ছে রাজাকার আলবদরদল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গেটে সেন্ট্রি এবং ক্যাম্পাসে সশস্ত্র টহল থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ভবনের নিরাপত্তা রক্ষায় নেওয়া হলো এক কড়া ব্যবস্থা। লোহার কলাপ্সিবল্‌ গেট সঁচূলিত করে একজন মানুষ যাবার মতো ফাঁক রাখা হলো। সেখানে দুজন সশস্ত্র জওয়ান। প্রত্যেক প্রবেশকারীর পরিচয় পত্র পরীক্ষা করার পর তার প্রবেশ অনুমতি। পরিচয় পত্র মানে আইডেটিটি কার্ড, সংক্ষেপে ডাওি কার্ড সেই দুসময়ে এক বড় রক্ষা কবচ। আমার উপর নতুন দায়িত্ব চাপালেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রশাসন ভবনে প্রবেশাধিকার প্রদানের ব্যাপারে ভারযোগ কর্মকর্তা আমি। অর্থাৎ প্রশাসন ভবনে কখনো যদি কোনো দৃঢ়ত্বকারী চুক্তি পড়ে কিংবা সেখানে যদি ঢাকা শহরের মতো বোমাবাজি হয়, তাহলে আমিই দায়ী। এই নতুন দায়িত্ব আমাকে কেন দেওয়া হলো জানিনা। হয়ত গেটের পাশেই আমার দফতর, তাই। অথবা নতুন করে অমূলকে ফাঁসাবার মতলব, কি জানি। আমার নতুন দায়িত্ব পালনের কাছে শরীর চৰ্চা বিভাগের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রুক্টর আবেদ আলী সাহেবকে যুক্ত করা হলো কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে। এই ঝুকিপূর্ণ দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা না থাকলেও আবেদ আলী সাহেব তখন নিরূপায়, কেননা কর্তৃপক্ষের আদেশ। আবার শুরু হলো আমার এক নতুন চৈমন্তন। দেশের এখানে ওখানে বোমাবাজির খবর পেলেই ভাবি, এই বুবি এই বুবি আমাদের প্রশাসন ভবনেও একটি বোমা ফাটলো। আর এখানে বোমা ফাটার ফলাফল আমাদের চরম দণ্ড।

এই রকম এক সময়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে এলেন মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ। নবাব আবদুল লতিফ হল মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতি ছিলেন ভাইস চ্যাম্পেল। এই অনুষ্ঠানের কথা আমাকে আগে বলা হয়নি। শেষ মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের আদেশ 'ফটোগ্রাফার চাই।' শহরে ছুটলাম আমি। ফিরতি পথে গাড়ির চাকা পাঠাচার। সভা শুরু হতে তখন কয়েক মিনিট বাকী। আমি জানি, পান থেকে চুপ খসলে অস্তুৎঃ আমার রক্ষে নেই। যথাসময়ে ফটোগ্রাফার আমাকে হাজির করাতেই হবে। তাই অবশ্যে নিরূপায় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিকেলের বাসকে পথে থামিয়ে সেটা ঘূরিয়ে আনলাম সোজা নবাব আবদুল লতিফ হলের সামনে। অন্যান্য যাত্রী কাউকে কোথাও নামতে দিলাম না। এমারজেন্সি কোনো আইন মানেনা। ফটোগ্রাফার নিয়ে যখন মিলানায়তনে ঢুকছি, তখন মেজর জেনারেল সাহেব তার বক্তৃতা শুরু করছেন। মিটি মিটি কথায় তিনি সবাইকে বোবাচ্ছেন যে সাঁকো উড়িয়ে সরকারী সম্পত্তি পুড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি চমৎকার করে আমাদের জ্ঞান দান করলেন যে এ দেশটা নাকি আমাদের, আমরাই নাকি এ দেশের নাগরিক। অতএব দেশের ক্ষতি মানে আমাদের ক্ষতি। মুক্তিবাহিনীর নাশকর্তা মূলক কাজের বিরুদ্ধে রুধি দাঁড়াতে বললেন তিনি।

ইঝা বছরের শেষার্থে পাকসেনাদের মনের গভীরে মুক্তিবাহিনীর ভয় প্রায় সর্বক্ষণ কার্যকরী। তালাইয়ারী বাঁধের পাশ দিয়ে একদিন রিকশায় চলতে চলতে হঠাতে কানে এলো : ‘জলদি করো, জলদি করো, মুক্তি আ-পড়া’। চমকে তাকাই—এক জওয়ান কয়েকজন মানুষকে মাটি খোড়াখুড়ির কাজে জবরদস্তি খাটাছে আর ওই কথা বলছে—‘মুক্তি আ-পড়া, জলদি’। মুক্তি মানে মুক্তিবাহিনী আর মাটি খোড়াখুড়ি মানে এই বাহিনীর আক্রমণ আশঙ্কায় লুকোবার গর্ত নির্মাণ—এটা মনে হতেই আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে এক ঝলক সুবাতাস। আহ ! কি মধ্যে বাক্য ‘মুক্তি আ-পড়া’।

কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কেউ সত্যি সত্যি এলে তাকে আশুয় ও নিরাপত্তা দেওয়া সহজ ছিল না। ওই সময়ে একদিন খুলনার তরঙ্গ রাজনৈতিক কর্মী জাহিদ এলো আমার বাসায়। ঘোড়ে চেহারা। এখানে ওখানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সদীপনের কবি জাহিদ, চেতনায় আমার একান্ত কাছের মানুষ। ওর কাছেই প্রথম পেলাম একান্তরের সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃষ্টস্বাদ : আমাদের প্রাণপ্রিয় গুরু সদীপনের সভাপতি বন্ধু অধ্যাপক খালেদ রশিদ পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ার পর সেনানিবাসে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। গুরুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের স্পর্ধিত ছায়ার তলে একদিন সারা দেশের মানুষ দাঙিয়ে স্বত্ত্বালভ করবে, এমন ভাবনাও মাঝে মাঝে আমার মনকে টুঁয়ে গেছে। সেই গুরু ঘাতকের শিকার, এ যেন আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের শুষ্ঠের পতন। মুক্তিযুদ্ধ চলছে দেশব্যাপী। আর কতদিন এই লড়াই চলবে কে জানে। কত স্বজন যে আমাদের হেতু চলে গেছেন, তারও কোনো হিসাব তখন নেই। আমাদের এই অস্তিত্বের নিষ্পত্তি আর কদিন। যে কোনো মুহূর্তে জীবন অবসান সম্ভব। মাথার উপরে খড়গ। সীমান্ত পার হতে পারলে হয়ত বিপদকে একভাবে পাশ কাটানো যেতো, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বাস মানেই প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখ্যমূর্চ্ছ। তখন ভাবতাম, যে অভিজ্ঞতায় আমরা প্রতিদিন দপ্ত, তা কি কখনো কাউকে বলা হবে। কেউ কি জানবে আমরা একটি বন্দী শিবিরে কেমন ছিলাম, কেমন কাটতো আমাদের সেইসব দিনরাতি।

আমার বাসায় একদিন বাস করেই সদীপনের জাহিদ বুঁবলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে থাকাই অনেক বেশী নিরাপদ। একে ক্যাম্পাস নামক সেনানিবাস বধ্যভূমি, তার উপর আমার মতো মানুষের সাথে বসবাস অর্থাৎ বন্দুকের নলের মুখে দিন যাপন আর কি। জাহিদ চলে গেল।

দেশের চারদিকে ঘনঘাটা তখন বলছে : ঝড় আসছে। সকলের কৌতুহল, কি হবে কি হতে যাচ্ছে ! মুক্তিবাহিনীর যত্নত্ব অপারেশন ও সাফল্য কি বাস্তবিকই সত্যি কিছু, না চরমপত্রের অলীক কল্পনা। উদ্বেগ উৎকর্ষায় দিন আসে, দিন যায়। তুণ্ড তারই মধ্যে ক্লাস, পরীক্ষা, দ্বিতীয় ভাইস চ্যাম্পেলর ডং মুমতাজুর্দিন আহমদের মৃত্যুতে শোক সভা, কায়েদে আজম জিরাহ মৃত্যু বার্ষিকী সবই হচ্ছে। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্মেলনে আমাদের শিক্ষকেরাও যাচ্ছেন।

পাকিস্তানের চারপাশে দুর্যোগ ঘনিষ্ঠে উঠেছে। তাই দেশের তরকি ও হেফাজতের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমরা অনেকে মিলিত হলাম তৎকালীন ঝিন্নাহ হলের নামাজ কক্ষে। দোওয়া ই ইউনুস পাঠে সে কি ধূম ! লক্ষ লক্ষবার উচ্চারিত হলে এই দোওয়া। কিন্তু তাতেও কি পাকিস্তানী অবাঙালির মন পাওয়া যায়।

জিমাহ হল থেকে বেরোবার পথে দেখি ডঃ মতিউর রহমান ও জনৈক ক্যাস্টেন। আমাদের সম্বন্ধের কারণ জানতে চাইলেন ডঃ রহমান। বললাম, দোওয়া ইউনিস পাঠ হলো লক্ষ লক্ষবার।

‘কিস্মিয়ে?’

‘পাকিস্তান কি হেফাজত ঔর খয়ের কে লিয়ে’। ওদের খুঁটী করবার উদ্দেশ্যে একটু উচু গলায় বললাম আমি। কিন্তু নিষ্কল সেই মনোরঞ্জন সাধনা।

‘পাকিস্তান কি খয়ের কে লিয়ে’ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে ক্যাস্টেনের দিকে তাকিয়ে চোখ মারলেন ডঃ রহমান, ‘কেয়া সমাবস্তা?’ তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : ‘আছা, বহু আছা।’ তাঁর চোখেমুখে বিশাঙ্ক বিদ্রূপ। অর্থ, তোমরা বাঙালিরা ডগুয়া শুরু করেছে। আমি তা দেখেও না দেখার এবং বুঝেও না বোঝার ভান করে হে-হে-হেসে চলে এলাম।

আমাদের মর্যাদার আর একটি নম্বনা দিই। পাকিস্তান কাউন্সিল রাজশাহী শাখায় ইরানী রাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বাস্তিকী অনুষ্ঠান শেষে ভাইস চাম্পেলের ডঃ বারীর সাথে ফেরার পথে তালাইমারী মোড়ে আমাদের গাড়ী খামালো এক জওয়ান। কি ব্যাপার। কি অভিযোগ। শোনা গেল, আমরা যে গাড়ীতে যাচ্ছি, ঠিক ঐই রকম একটি গাড়ী নাকি তার আগের দিন ওই জওয়ানের একটি মূরগী চাপা দিয়ে যেরেছে। অতএব আগে সেই মূরগী চাপা দিয়ে মারার বিচার হবে, তারপর আমাদের গাড়ী ছাড়বে সেই যতই তাকে বলি, গাড়ীতে স্বয়ং ভাইস চ্যাম্পেলের বসে আছেন—আপাতত আমাদের যেতে দেওয়া হোক, মূরগীর দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে, সে কি আর সে কথা শেনেন? আন্ত গোয়ার সে। অবশেষে ডঃ বারী নিজেই মুখ খুললেন এবং সেই জওয়ানকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে কর্ণেল সাহেবে তাঁর পরিচিত, এই মূরগীর ক্ষতি পুরস্কারব্যবস্থা কর্ণেল সাহেবের সাথে আলোচনা করে অবশ্যই নেওয়া হবে। আমরা জওয়ানের হাত থেকে রেহাই পেলাম। হয়রে হায়। দুর্ঘটনা বশত গাড়ীর চাকায় পিছ মূরগী হত্যার বিচার দাবী করছে একজন দখলদার জওয়ান, অর্থাৎ সুপরিকল্পিত ভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালির হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবীর কোনো অধিকার আমাদের আছে কি? এই নামহীন জওয়ানের গোয়াতুমির ফলে তখন আমার চেতনায় দৃষ্টিকের জ্বালা। আমরা কত অসহ্য। রাজপথের চারপাশে আমার মায়ের ধৰ্মিতা উলঙ্গ লাশ। তাতে কি। আমরা তো ক্রীতদাস। তাই ক্রীতদাসের সম্মানই আমাদের তখন প্রাপ্য।

সীমান্ত সম্বর্ধ এবং এদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহীর গেরিলা কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় জওয়ানদের এই গোয়াতুমি কমে গেল। ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতেই দ্রুত ভাঙলো ওদের মনোবল। ওদের অনেকেই বুঝে নিল, বাঙলার মাটি দুর্জয় ধাটি, এখানে টেকা যাবেনা। স্বদেশে মানে পক্ষিম পাকিস্তানে ফেরার জন্য তখন এইসব বীর জওয়ান প্রত্যেকেই ব্যাকুল। কোনো অজ্ঞাহতে কেউ ছুটি পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। যে ছুটি পাচ্ছেনা, সে তখন দুচোখে অক্ষকার দেখছে। এক বড় লড়াই আসব এবং এই জঙ্গে ওরা ফতেহ হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে ওদের নিঃশ্বাস, সেটা বুঝতে আর বাকি নেই কারো। ফুর্তি শেষ, এখন অনুশোচনা, শুধু অনুশোচনা আর পাপ ও দুর্কর্মের জন্য পরম করুণাময়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ওদের মুক্তির পথ-এমন এক মনোভাবেরই পরিচয় পেলাম একদিন। কাজলা গেটে এক সেন্ট্রি। জাতে পাঞ্চাবী। কি এক কথায় কথায় দারুণ আবেগপ্রবণ হয়ে শোনালো তার তীব্র অনুশোচনা। কেমন করে শত শত মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে, কেমন করে কত

কত মানুষকে খুঁটিয়ে মেরেছে এইসব বিবরণ দিতে দিতে তার গলা ধরে এলো : ‘আপ লোগ নেই জানতে হয় কেয়া কিয়া। খোদা মুখে মাফ কর দে, মাফ কর দে।’

নভেম্বর নাগাদ আলবদর-রাজাকার ছাত শিক্ষকদের লক্ষ্যবস্তুস্পে স্থানীয় আবহাওয়া আবার গরম। চারদিকে মুক্তিবাহিনীর হামলা ও সাফল্যের খবর, দেশ বিদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইলিয়া গান্ধীর কৃটনিক সফর এবং বাঙ্গলাদেশের পক্ষে সমর্থনলাভ ও বিশ্ব জনমত গঠন ইত্যাদি কারণে ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে দালালদের আত্মপ্রত্যয়। তাই একটু দৌড় ঝাপ চাই বৈ কি। কিন্তু এই তৎপরতাই হিল আমার জন্য সতর্ক সংকেত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্দী শিবিরে আর নয়। নির্যাত মৃত্যু এড়াতে এবার পলায়ন আবশ্যিক। কোথায় পালাই। ঢাকার জনারণ্য মনে হলো অনেক নিরাপদ। আর তাই কদিনের ছুটি নিয়েই আমি ক্যাম্পাস থেকে লা পাতা। এবারে আমার সিদ্ধান্ত যে অস্ত্রাঞ্চল, তার প্রমাণও পেলাম পরবর্তী কালে। আমার ক্যাম্পাস ত্যাগের পরপরই আমার ঢাকার ঠিকানা বলার জন্য নানা চাপের মুখে পড়লেন অর্ডারলী পিঅন আবুল বাশার। কিন্তু ঠিকানা তাঁরও জানা ছিল না। আমার ঠিকানার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-সামরিক বাহিনী লিয়াঁজো অফিসারের এই উদ্যোগের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়।

কদিন পরেই সৈদ। রোজার মাসে দীর্ঘ বাস যাত্রা! পথে কোথাও খাদ্য মেলে কি মেলে না, তাই বড়ই দুর্বিস্মা। অচ্ছজনিত কারণে আবার কিছু খাদ্য না হলেই নয়। আমার দুর্ভাবনা দূর করলেন প্রতিবেশী ভাবী, ডঃ জব্বারের স্ত্রী—পাঠালেন এক বাটি ভর্তি স্বহস্তে প্রস্তুত মাংসের চপ। হয়ত নিছক সৌজন্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে এই সহজদয়তায় আমি অভিভূত। ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে এক একটি মানুষ মাঝে মাঝে কত বড় হয়ে ওঠে, কত কাছে এসে যায়। ঢাকার পথে সফর সঙ্গী হলেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শামসুন্দিন। রাজশাহী ছাত্রতেই হাস্কা হয়ে গেল মন প্রত্যখন বাতাস ছুটুক তুফান উটুক ফিরব না গো আর। যা হবার তা হবে।

নগর বাড়ী ঘাটে একটু ধূমপানের উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছি। রোজার দিনে ধূমপানের আড়াল চাই, নইলে এই অজুহাতে আশেপাশের জওয়ানেরা কি কাণ দীঘাবে কে জানে। একটি চায়ের দোকান দেখলাম পর্দা মোড়া। সন্তর্পণে সেখানে চুক্তেই দেখি এক জওয়ান পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটে ফুকছে। আমাকে দেখেই কেন জানিনা জবাবদিহির সুরে বলে উঠলো :

‘সফর মে রোজা কেয়া হ্যায়? রোজা কেয়া হ্যায়?’

আমি তাকালাম তাঁর দিকে। আবার একটু হেসে সেই কৈফিয়তের পুনরাবৃত্তি :

‘সফর মে রোজা কেয়া হ্যায়?’

আমি নিচিন্ত মনে একটি কাঠি ধরলাম। জওয়ানটি ধূমপানের সঙ্গী পেয়ে গল্প জড়লো। বাড়ী ফেরার ছুটি পেয়েছে সে। তাই মহাবুরী। তবে সঙ্গী যাদের ফেলে যাচ্ছে, তাদের জন্য সেই জওয়ানের খুব আপসোস : ‘দো দিন বাদ কেয়া হোগা, কেয়া কেয়া মানুম!’ অর্থাৎ হাওয়া বদল সবাই টের পেয়েছে -কেউ বলছে, কেউ বলছে না।

ঢাকায় পৌছতে পৌছতে প্রায় সঙ্গে। অর্থাৎ সফরসঙ্গী অধ্যাপক শামসুন্দিনের গন্তব্য অন্য কোথাও, দূরে। রাতে পথ চলাচল বিপজ্জনক। আমাদের সাথে রাত কাটালেন তিনি।

পরদিন খুব ভোরে তিনি চলে যাবার পর বাড়ীর সবাই ঘিলে চায়ের কাপ হাতে আমরা আজড়া দিছি, এমন সময় দরজায় কড়া নড়লো খুব জ্বরে। জানালা দিয়ে উকি মারতেই দেখা গেল বাড়ীর সামনেই দাঢ়িয়ে কচ্ছন সশস্ত্র জওয়ান। এক মুহূর্তে বাসার সবাই ভয়ে চুপ। আমি ঠিক তখনই ঘাবড়ে যাইনি। দীর্ঘ আট মাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটনমেন্টে বাস করে পাকসনাদের সাথে কথাবার্তা বলায় একটু আধুনিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে আমার সাহস বেড়ে গেছে। আর তাজড়া প্রাণে বাঁচার জন্য মিলিটারী কায়দায় উর্দু বাক্য বিন্যাস ও প্রক্ষেপণের কসরৎ কর ছিলনা আমার। সবাইকে অভয় দিলাম : ‘আমি দেখছি, কোনো ভয় নেই।’

দরজা খুলে হ্যাসিমুর্খে জওয়ানদের অভ্যর্থনা জানালাম আমি : ‘আইয়ে, আস্ স্লা-।’ প্রথম জওয়ানটি আমার কোনো কথার উপর না দিয়ে তড়ক করে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের নলটি আমার বুকে ঠেস আমাকে ঠেলে ঠেলে পিছু হঠাতে হঠাতে বললো—‘নিকালো, পিস্তল নিকালো, বোমা নিকালো ওআরনা গোলি মারেগা, নিকালো—।’ আমার এই অবস্থা দেখে বাসার সকলের সে কি ভয়াত্ত হল। প্রায় হ্যাউমাউ শুরু হয়। আমার খোলায় যত উর্দু লফজ্ব ছিল, আমি দ্রুত একে একে ঝাড়তে লাগলাম। আমার উর্দু জ্ঞান প্রদর্শন করে ওদের ইমপ্রেস করার চেষ্টা আর কি। অর্থাৎ আমি বাঙালি হলেও উর্দু ভালোবাসি, উর্দুই আমার ভাষা। কিন্তু আমার সেই উর্দু জ্ঞানের বর্ম নিষ্কল। জওয়ানটি আমাকে ছাড়েই না। শেষে হঠাতে তার চোখে পড়লো একটি স্টীল ট্রাংক। তারপরই আমাকে ছেড়ে অন্য মতলবে বাবের পর বাঁক খুলে খানাতলাশীতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আর এক জওয়ান আমার শ্যালিকা মেরীর হাতের চায়ের কাপটি এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে ছুড়ে মারলো বারবন্দায়। রোজার দিনে চা পান! দারুণ অপরাধ! অস্ত্রীর মাঝ চাইলাম : ‘বাচ্চি লড়কি’ অর্থাৎ ওর জন্য আর রোজার কড়াকড়ি কেন। মৃত্যুবিচয়ে উঠলো সেই জওয়ান : ‘বাচ্চি কীহা?’ তারপরই একটি অলীন বাকি উচ্চারণ করলো সে। আমরা সবাই তখন বধি।

ওদিকে সেই প্রথম জওয়ানটি যে কিনা পিস্তল ও বোমা উজ্জ্বরের জন্য আমার বুকে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের নল চেপে ধরেছিল, তখন সে একটি ট্রাংকে কিছু সোনা ও টাকা পয়সা আবিষ্কার করে মহানদৈ সেগুলি নাড়ানাড়ি করতে করতে বিড়বিড় করতে লাগলো। ‘ইয়ে সোনা ইয়া চান্দি? কেতনা রূপেয়া হ্যায়?’ আমার শ্বাসে পাশে দাঢ়িয়ে নিরস্তর। জওয়ানটির মতলব তার চোখেমুখে চকচক। আমার শ্বাসে সেই ট্রাংকের কাছ থেকে একটু নড়ছে না দেখে প্রচণ্ড ধরক মারলো সেই জওয়ান : ‘যাও উধার যাও, কেয়া দেখতি হো?’ লঙ্ঘ উর্দুতে আমার শ্বাস দৃঢ় কঠেই বললেন : পিস্তল বোমা খাকলে আমাদের ধরো, কিন্তু সোনা কিংবা টাকা পয়সা নিতে পারবে না, তাহলে কর্ণেল সাহেবকে বলে দেব। শেষেকুঠি ওষুধে কাজ হলো। ওয়া এক সময়ে চলে গেল। পরে জানলাম কাছাকাছি অন্যান্য বাসাতেও সার্চ হয়েছে, ওদের অফিসারও ওই সময়ে ছিল আশেপাশে। কলাবাগান নাকি মুক্তিবাহিনীর বিছুদের ধাটি, তাই এই সারপ্রাইজ সার্চ।

জওয়ানেরা চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের দুর্দিষ্টা কাটলো না, বরং বাড়লো শতগুণ অন্যভাবে। সোনা দানা টাকা পয়সা অনেক নাড়ানাড়ি করেও শেষ পর্যন্ত ওয়া কিছুই হাতাতে পারেনি। নিচয়ই ওইসব বস্তুর লোভে লোভে ওয়া আবার আসবে। তাই একটু সরে থাকা ভালো। বিশেষ করে সোনা দানা টাকা পয়সা কিংবা অল্পবয়সী মেয়েদের ওই

বাসাতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। আমাদের এই বিপদের কথা শুনে আমার এক পরমাত্মীয় সৈয়দ মনসুর জিলানী, আমরা ডাকি নাম্বা চাচা, আম্বুরেণ জানলেন। তাঁর মন্ত্রী বিদেশিনী, গ্রীক। ধনমণি এলাকায় তিনতলায় তাঁর ফ্লাট। সেখানে জওয়ানদের এ ধরনের উৎপাতের আশঙ্কা কম। বিদেশিনীর গহে ঝামেলা পাকানো এত সহজ নয়, খুঁকি আছে। এত সব ভেবেই নাম্বা চাচার উষ্ণ আতিথ্য গ্রহণে আমরা সম্মত হই। আমার আর এক পরমাত্মীয় ইউনুস টোধুরী তাঁর গাড়ীতে স্ত্রী পুত্র কন্যা ও তিনি শ্যালিকা সহ আমাকে পৌছে দিলেন নাম্বা চাচার বাসায়। ইউনুস ভাই তখন প্রায় সমাজকর্মী। শুধু আত্মীয় স্বজন নয়, মুক্তিবাহিনীর বিছুদ্রেও খোঁজ খবর রাখছেন, স্ত্রী ডাঙুর ফাতেমা টোধুরীর মারফতে ওশুধ সংগ্রহ করে তাদের পাঠাচ্ছেন। বেশ সাহসী তাঁর চলাফের।

আমাদের অনুমুন সঠিক, নাম্বা চাচার আশুর বেশ নিরাপদ। প্রায় এক সপ্তাহ মহা আয়েশে আরামে কুটোলা গ্রীক চাচীর আতিথ্যে। আর নাম্বা চাচা সৈয়দ মনসুর জিলানী তো দারুণ প্রাণখোলা আজডাপিয় মানুষ। একদা শুমিক নেতা ছিলেন ভারতে, সাংবাদিকতা করেছেন তিনি দেশ বিদেশে রয়েটার, প্রাভদয়। তাই নাম্বা চাচার গল্প শুনতে শুনতে ভুলেই গেলাম কি দৃঃসহ কাল তখন আমরা কঢ়াচ্ছি। বেশ কদিন এভাবে আনন্দে থাকার পর মনে হলো, এবার বাসায় ফেরা যাক। আর কদিন এয়ন করে সাত সাতটি মানুষ অন্য বাসায় পড়ে থাকা যায়। তাই সহস্র গ্রীক চাচীর প্রবল আপত্তি ও একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করেই কলাবাগানে ফিরে এলাম আমরা। এবারও ইউনুস ভাইয়ের গাড়ীতে পারাপার। ইউনুস ভাই সাহসও দিলেন, ‘রাতে কেনো ভয় নেই? যাতের ঢাকা আমাদের দখলে’। এই একই কথা বক্সু সাংবাদিক কে বি এম মাহমুদের মুক্তেও প্রায়ই শোনা হচ্ছে : ‘রাতের ঢাকা আমাদের দখলে, রাতের ঢাকায় যত্নত ঘুরিনি নির্ভয়ে গাড়ী চালাই; ওরা বের হয় না’ ইত্যাদি ইত্যাদি। মাহমুদ তো একদিন স্তুর্যে ঘোষণাই করলো, ‘এক মাসের মধ্যে দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে।’ তখন কঞ্চিত পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। স্বপ্ন কি এত তাড়াতাড়ি ফলতে পারে! অথচ আশ্চর্য, হলো তাই চিরকালই মাহমুদ এক দারুণ ধারালো ব্যক্তি। ওর তুলনা নেই।

ঈদের একদিন আগে যখন কলাবাগানে ফিরেছি, তখন আসল ঈদের কারণে সকলের মন কিছুটা প্রসন্ন। কেননা আমার শ্যালকেরা যে দেখানে চাকুরী করে, সবাই ঈদে মিলিত হচ্ছে ঢাকায়। সেই দুর্দিনে এ রকম একত্র হওয়ায় কত স্বন্তি! কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সক্ষে হতেই আমাদের সব সাহস ও স্বন্তি উঠাও। সদর দরজাছ উপস্থিত ঢেলা কোর্তা পাঞ্জামা পরা চারপাং জন পাঞ্জাবী জওয়ান। দরজা খুলতেই হড়মড় করে ঢুকলো তারা। কি ব্যাপার! আমাদের বাসাতে নাকি অন্ত আছে, ওদের পাকা খবর। অতএব সার্চ। সব ঘরে দ্রুত তল্লাপি সেবে ওরা এলো প্রথম ঘরে এবং সেখানে একটি বিছানার তোকর উল্টিয়েই ওরা হেন কিলু জানোয়ার হলে গেল। এক ছুট পাশের ঘর থেকে নীল শাড়ী পরা আমার স্ত্রীকে পাকড়ও করে এনে বিছানার তোকর দেখিয়ে চার্জ করলো :

‘ইহা কৃচ থা। কীহা হঠায়আ?’

‘কেয়া থা?’ আমার স্ত্রী অবাক।

জওয়ানেরা কিন্তু বলবে না, তোকরের নিচে কী ছিল। নীল শাড়ী পরা একজন ঔরৎকে ওই ঘরে একটু আগে ঢুকতে ওরা দেখেছে, অতএব সে নিশ্চয়ই কিছু লুকিয়ে ফেলেছে।

কি অস্তুত কথা ! আমার স্ত্রী যতই বলেন ‘বোলো কেয়া থা’ ওরা ততই গজ্জন করে ‘কাহা হঠায়আ দে দো’। তুমুল তর্ক। শেষে এক পর্যায়ে উর্দু বাংলার বিচুড়ি পাকিয়ে আমার স্ত্রী ওদের মুখের উপর ঝাড়তে লাগল, ধার অর্থ এই রকম : ‘তোমরা নকল আদমী, ঝুট জওয়ান, সার্ট ফার্ম মিথ্যে, তোমাদের মতলব খারাপ, কোনো অহিলায় লুঠ করতে এসেছো, কর্ণেল সাহেবকে টেলিফোন করে এক্ষণি তোমাদের মজা দেখাইছি, দাঢ়াও !’

আসলে কিন্তু কোনো কর্ণেলই আমাদের জানাশোনা ছিল না। তবে এ রকম উৎপাতে আগে দু একবার কর্ণেল নামটি ব্যবহারে সুফল পাওয়ায় আমার স্ত্রী এই মোক্ষম অন্তর্ভুটি প্রয়োগ করলেন। হ্যাত তাঁর ধারণা ছিল, এই নাম উচ্চারণের সাথে সাথে ওরা লেজ গুটিয়ে নেবে। বাস্তবে তা হলো না। বরং ওদের রাগ এমনই চড়ে গেল যে আমাদের সববাইকে বাড়ীর ভিতরে বারান্দায় দাঢ় করিয়ে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠেনে নেমে আমাদের দিকে তাঁর স্বয়ংক্রিয় অন্তর্ভুটি উচ্চিয়ে ধরলো।

আমার ভালোমদ্দ জ্ঞান তখন প্রায় বিলুপ্ত। তোষকের তলা থেকে আমার স্ত্রী কী সরাতে পারেন, আমার ধারণাটীত। কিন্তু ক্রমাগত তাঁর অঙ্গীকৃতির ফলেই যে ঘটনার এই পরিণতি, আমরা সবাই গুলির মুখে সেটা বুবেই স্ত্রীর উদ্দেশে অনর্গল উর্দুতে হিতোপদেশ বর্ণণ করলাম। কি বলেছিলাম, ঠিক ঘনে নেই। তবে মূল বক্তব্য এই রকম : ‘তুমি জানোনা এই বীর সেপাহীরা আমাদের কওমের দোষ্ট। আমাদের ভালোর জন্য ওরা জ্ঞান কোরবান করছেন। ওরা নিশ্চয়ই সত্যি কথাই বলছেন। বলো, কী লুকোলে ? কোথায় লুকোলে ?’ আমার স্ত্রীর একই কথা : ‘জনিনা জনিনা !’ শেষে আমার আচরণ প্রায় পাগলের মতো। জওয়ানদের খুশী করবার জন্য স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর গালে বসিয়ে দিলাম এক প্রচণ্ড চড়। ও রকম আঘাতে তৎক্ষণাত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন আমার স্ত্রী। বাড়ীময় হাউমাউ। সে কি চেম্পেছি। সারা পাড়ায় শোর গোল ওঠে আর কি।

এমন সময় এক অবাক ঘটনা। শান্তি পোশাকী এইসব পাঞ্চাবীদের ট্যাকসী ড্রাইভার বাসায় ঢুকে ওদের কানে কানে ফিস ফিস করে কি এক মন্ত্র শোনাতেই তৎক্ষণাত ওরা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আমার তখনও ঘোর চলছে, বুক্সুজি বিন্দুমাত্র নেই— দেখছি ওরা ভয়ে পালাচেছে, তবুও ওদের পথ আগলে বলছি, ‘সার্ট কিজিয়ে সার্ট কিজিয়ে, কৃত নেই হ্যায় !’ ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল।

ওদের এমন ত্বরিত নিষ্ক্রমণের কারণ তৎক্ষণি জ্ঞান গেল। আমাদের বাসার মুখোমুখি বাসায় ছিলেন মীর্জা আলী আশরাফ সাহেব। বড় ব্যবসায়ী, ঢাকা চেম্বার অব কর্মসূরির সভাপতি অথবা ওই রকম কোনো কর্মকর্তা। সঞ্জ্যবেলা শাদা পোশাকী জওয়ানেরা ভাড়াতে ট্যাকসীতে এসে একটি বাড়ী সার্ট করতে ঢুকেছে অথচ ট্যাকসীর স্টার্ট পর্যন্ত বন্ধ করা হচ্ছে না—এসব দেখে শুনে মীর্জা আশরাফ সাহেবের সন্দেহ হয় এবং তিনি বাসার একটি কাজের লোককে চুপ করে ট্যাকসীর নম্বর দেখে নিতে বলেন। একটি লোক ট্যাকসী নম্বর দেখে নিছে—সেটা লক্ষ্য করেই ভৌত হয়ে পড়ে ড্রাইভার। তাই ওরা দ্রুত পালিয়ে যায়। অর্ধাং আমার স্ত্রীর কথাই ঠিক— ওরা লুঠেরা।

পাঞ্চাবী লুঠেরার দল চলে যেতেই উঠে বসলেন আমার স্ত্রী। না, জ্ঞান হারান নি তিনি। বরং সেদিন তাঁর মাধ্যাই সবচেয়ে সচল। তাঁর মুখেই ঘটনার বাকিটা শোনা গেল। ওই পাঞ্চাবীরা বাসায় ঢুকেই প্রথম ঘরে বিছানার তোষকের নিচে গোটা ছয়েক পেন্সিল সাইজ

কার্তৃজ লুকিয়ে রাখে। অনেক দূর থেকে আমার স্ত্রী দেখে ফেলেন এই ট্র্যাপ। ওয়া যখন অন্য ঘরে সার্চ ব্যস্ত, আমার স্ত্রী তখন এই কার্তৃজগুলি সরিয়ে উঠোনের শেষে পাঁচিলের ওপারে ফেলে দেন। ওদের ট্র্যাপ ফেল করায় কিন্তু হয়ে গঠে ওয়া। নীল শাড়ী পরা একটি উঠোনকে ওই ঘরে ঢুকতে দেখেছে ওয়া, অতএব সে-ই নিষ্ঠয় কার্তৃজগুলি সরিয়ে ফেলেছে - অব্রাহাম ছিল ওদের এই ধারণা, আর তাই আমার স্ত্রীর উপরেই পড়ে ওদের প্রচণ্ড আকেশ। তাহলে ব্রাকমেলের উদ্দেশ্যে সবটাই ছিল এক বড় ফাঁদ প্রস্তুন। আমার স্ত্রীর উপস্থিতি বুঝি ও সাহসে বিস্মিত হই আমরা।

দুর্ঘটনার এই হামলার বিষয়ে ধারায় জানানো হলো। এক বাণ্ডালি দারোগা এলেন। রাত তখন প্রায় নটা। দারোগা বললেন, ‘এসব অভিযোগ লিখে নিছি, তদন্ত করেও যাচ্ছি, তবে কোনো লাভ নেই। আমরা কিছুই করতে পারবো না। আর কেন পারবো না, বুঝতেই পারছেন।’

আবার নতুন এক ভয় আমাদের মনে, বাসাটি নিরাপদ নয়। যে কোনো কারণেই হোক, আমাদের বাসাটি ওদের নজরে পড়েছে। এখানে আর নয়, একটি বড় ফ্লাটে, চাই কি যে কোনো ভাড়ায় চলে যাওয়া দরকার। কিন্তু নতুন বাসা খুঁজে পেতেও সময় চাই। এদিকে এ বাসায় একদিন ধাকাও বুঝি। এই সমস্যার সমাধান করলেন প্রতিবেশী মীর্জা আশরাফ সাহেব। অত্যন্ত সজ্জন ও সাহসী ব্যক্তি। তার আমন্ত্রণ ও নিরাপত্তার আশ্বাসে কনিনের জন্য তাঁর বাসাতেই উঠলাম আমরা কজন।

২০শে নভেম্বর ইদ। আমার স্বশুর একাই ব্যাঙ্গ পড়ে এলেন। তিনিদিন পর ঘোষিত হলো দেশের জরুরী অবস্থা। নতুন করে যোক্ষণার কিছুই ছিলনা। বেসামরিক গভর্নর আর মন্ত্রিসভা যা-ই ধাকুক না কেন, জরুরী স্থিতিত্ব ছাড়া কিই বা ছিল তখন?

মগবাজারে বড় এক ফ্লাটের দ্বিতীয় দিলেন শিল্প ব্যাংকের ম্যানেজার বন্ধু আবু তালেব। চমৎকার বাসা। ডগুপতি প্রকৌশলী বজ্রলুর রহমানের সৌজন্যে সরকারী পিক আপে মালামাল পারাপার করে ডিগ্রিড়ি সেই ফ্লাটে উঠে গেলাম আমরা। কিন্তু এত করেও যেন বিপদ এড়ানো গেল না। পদে পদে ফ্যাসাদ। নতুন বাসায় ওঠার দুতিনদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল সর্বাত্মক লড়াই, মুক্তিযুক্তের সবশেষ পর্যায়। ভারতীয় বিমান বহর এলো মধ্যবাতে। অক্ষকার আকাশে, ইংরাজী ‘V’ অক্ষরের মতো আলোর তীর, তেজস্ব বিমান বন্দরে ধোমা বর্ষণ, আমাদের দালানের আশেপাশে মুহূর্মূর খই ফোটার মতো বিমান বিঘ্রংশী কামানের অস্তিত্ব ঘোষণা। আমাদের চারপাশে এইসব অস্ত্রধার্টির অবস্থান সচেতনতায় যে কি অস্বস্তি আর দুর্ভাবনা! এক একবার মনে হয়, এইসব ধাঁচির লক্ষ্যে নিশ্চিপ্ত কোনো বোমা যদি পথ ভোলা হয়!

সকালে সিডিতে ভারী বুটের শব্দ। দুতিনজ্জন জওয়ান এলো আমাদের ফ্লাটে। অভিযোগ, গতরাতে আমাদের ফ্লাট থেকে টর্চলাইট ছেলে ভারতীয় বিমানকে নাকি সংকেত দান করা হয়েছে। কে বলেছে? কে দেখেছে? শোনা গেল, আমাদের জীবন বিপন্ন করা এই অভিযোগের উৎস এক দোকানদার, আমাদের বাসার সামনেই তাঁর দোকান। জওয়ানদের বলা হলো, সার্চ করুন এ বাসায় কোনো টর্চলাইটই নেই। জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে জওয়ানেরা সাবধান করে গেল, ‘ফির কতি এ্যায়সা সুনা তো গোলি চালায়গা।’

একি জ্ঞালা ! নতুন পাড়ায় এসেও রেহাই নেই। এখানেও মিথ্যে অভিযোগে পাক সেনাদের 'নেক নজরে' পড়তে হবে ! ওই দোকানদারের সাথে আমাদের কিসের শক্তা ! কেন সে এমন মিথ্যে অভ্যুত্তে জওয়ানদের ঢোকালো আমাদের ফ্লাটে ?

জওয়ানেরা যখন সার্ট করতে আসে, আমার স্ত্রী তখন সপুত্র ছাদে, সন্তুষ্ট ভারতীয় বিমানের প্রাত্যক্ষিক ঘূমলা এবং ওড়াওড়ি দেখার প্রত্যাশায়। ছাদ থেকে নেমে সব ঘটনা শুনতেই বিগড়ে গেল তাঁর মেজাজ। ছুটে গেলেন রাস্তার ওপারে দেকানদারের কাছে, বললেন : 'কাল রাতে আপনার দোকান থেকেই প্লেনগুলিকে লাইটের সংকেত দেওয়া হচ্ছিল, এ কথা আমরা রিপোর্ট করতে চাই।' একজন মহিলার এমন অগ্নিমৃতি দেখে দোকানদার একটু ঘাবড়ে গেল। আমার স্ত্রী মনের সাথে মিটিয়ে তাকে গালাগাল করলেন বটে, কিন্তু ওই দালানের অন্যান্য ফ্লাটের লোকজন আমাদের একটু সন্দেহের ঢোকে দেখতে শুরু করলেন। একদিন সব ফ্লাটের পুরুষেরা একত্রে মিলিত হলেন এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে বলা যে আমরা যেন কোন অবস্থায় দুর্ভিকারীদের আশ্রয় না দিই। তাহলে একের অপরাধের জন্য সবাইকে মরতে হবে। ভালো কথা। কিন্তু কথাবার্তার ধরন এমনই স্পষ্ট যেন আমরা নতুন ভাড়াটোরাই সেই দুর্ভিকারী, মুক্তিযুক্তের সমর্থক।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমান আরো ক'বার এসে গেছে। ঢাকার বিমান বন্দর সম্পূর্ণ ধ্বংস। একটি বিমানও ওড়ে না। শুধু প্লাট প্রটেকশন বিভাগের একটি হেলিকপ্টার কি ছাটো প্লেন গভীর রাতে গুড়গুড় শব্দ ছড়ায় আকাশে। শোনাগেল, এই হেলিকপ্টার থেকেই বোমা ফেলা হয়েছে তেজগাঁর কাছে কোনো এক এতিমখানার উপর। ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জ্ঞানুত করার অভিনব প্রচেষ্টা ! প্রজ্বল ছড়িয়ে গেল, একই উদ্দেশ্যে আবাসিক এলাকায়ও বোমা ফেলা হবে। সেলফ ক্রয়বিধি। এইসব নানা তথ্য নিয়ে বক্সু সাংবাদিক কে বি এম মাহমুদ ছুটলেন ইন্টারকনেক্টিবিদেশী সাংবাদিক হেজেল হাস্টের কাছে। মাহমুদ তখন খুবই বেপরোয়া, দৃংসাহসী। আর তয় করবেনই বা কেন ? মুক্তিযুক্তের সূচনাতেই যশোরে ঝগঁহে দখলদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন তাঁর বাবা ও দুই ভাই। সেই রাতে আবার যথারীতি প্লাট প্রটেকশন বিভাগের হেলিকপ্টার উড়লো আকাশে। গুড় গুড় শব্দ আমাদের উপরে উড়ে উড়ে আসে আর আমাদের বুক দূর দূর। কি জানি এক্ষণি হয়তো আবাসিক এলাকার জন্য নির্দিষ্ট সেই বোমার নিক্ষেপ। একটি অক্ষকার ঘরে আমরা সবাই একত্রে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি।

কোনো ঘরে রাত পোহালেই আবার সব দুর্ভাবনার অবসান। তখন এক একটি সুর্যোদয় মানে নতুন প্রতিক্রিতি নতুন সন্তুষ্ট বাসান নতুন সংবাদ। আকাশবাণী ও বিবিসির সঞ্চালনী ভাষ্য যথারীতি আমাদের প্রাণবায়ু। ভারত ৬ই ডিসেম্বর এবং ভূটান ৭ই ডিসেম্বর বাঞ্ছাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের শীক্ষিত ও র্যাফাদ দেওয়ায় স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের ভবিষ্যৎ— আর কদিন বাঁচলেই আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক।

ভারতীয় বিমান ঘূমলা তখনও একটু আধটু চলছে। রাতে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে। ঠিক বোমা নয়, গুলি বর্ষণ। কখনো গভর্নর হাউসে, কখনো হিলালী জ্বরত নিয়াজীর পলায়ন স্থান, এলিফ্যান্ট রোডে। মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ছাদে উঠে করতালির

মাধ্যমে এই গুলি বর্ষণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। সে এক অভূতপূর্ব দশ্য বটে। সবাই হেন মহানদে ছাদে ঘৃড়ি ওড়াওড়ি কাটাকাটি খেলা দেখছে। আমার স্ত্রীও সেই দলে সপুত্রে। কি হৈ তৈ চারদিকে। একটি নিরাপদ স্থানে স্টোর রুমের দেয়ালের আড়ালে প্রাণ বিহঙ্গটি সন্তুর্পণে আগলে আমি তখন কেবল কাল হরণ করছি। বড় শ্যালকের শিশুপুত্র এলিট এভাবে লুকোতে না চাইলেও তাকে জোর করেই ওই সময়ে সজী করতাম আমি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্দী শিবিরে বসবাসের ফলে আমার একটাই শিক্ষা : সাবধানের মার নেই।

আমার ধারণা ছিল ভারতীয় বিমানের গুলি বর্ষণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং নিক্ষেপ অভাস্ত। আসলে কিন্তু তা নয়। পরদিন বড় খালার মেজ ছেলে আমার সুজাতাই এসে শোনালেন এক ভয়বহু কাহিনী। নিয়াজীর পলায়ন স্থান মনে করে এলিফ্যান্ট রোডের যে বাড়ীটিকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়, সেটি আমারই বড় আশ্মা মানে বড় খালার বাড়ী। ছয়টি কামবার পাঁচটির ছাদ ফুটো হয়ে ধুসে গেছে। আর গুলি বর্ষণের সময় আমার মায়ের অগ্রজা তাঁর ছেলেমেঝে নাতিনাতনীসহ খোলা আকাশের নিচে সৌড়ে প্রাণ বাঁচান।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রত্যেকের কত স্বজন শহীদ, কত স্বজন সর্বস্বাস্ত তার কোনো হিংসাব তখনও আমাদের নেই। আমি নিজেই জানিনা আমার পিতৃব্য সংসারত্যাগী এ্যাডভোকেট জালালউদ্দিন চিরদিনের মতো নির্খোঁজ। আমাদের প্রত্যেকের কাছে ‘আমি রেঁচে আছি’—এই ভাবনাই ছিল তখন প্রধান। ডিসেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কোনো একদিন আকাশবাণী জানালো উত্তরাঞ্চলের লড়াইয়ে মুক্তিযোজ্ঞা আশফাকুল সামাদ শহীদ। পরিচিত নাম। তার মা সাদেকা সামাদ আমার খালা, আমিনদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। কিছুদিন আগেও তাঁর সাথে একবার দেখা হয়ে কলাবাগানে। কত খবর জানতে চাইলেন তিনি—রাজশাহীর খবরাখবর কি, মুক্তিযুদ্ধের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না, স্বাধীন বাঞ্ছনা বেতার কি বলছে না বলছে তা সত্ত্বাকিন্তা ইত্যাদি। অথচ একবারও তাঁর কোনো কথায় আমি আভাস পাইনি যে তাঁর পুত্র সুয়ং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়। এমন কত মহীয়সী জননীর ত্যাগের ফসল এই স্বাধীন বাঞ্ছনাদেশ, সে কথা আজ সবাই বিশ্মত। প্রিয় স্বজনের সাহসী ভূমিকার হঠাৎ আবার একদিন আনন্দ ও গর্বে উদ্বেল হলো বুক। ঢাকা পতনের সাথে সাথেই ফিরে এলো আমার সেজ আশ্মা মানে সেজ খালার তিন বীর বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা পুত্র—শাহাদতি, ফতেহ, মোরশেদ চৌধুরী।

‘হাতিয়ার ডাল দে’ মানেক শার পুনঃ পুনঃ ঝংকারে এগিয়ে এলো সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন—বিজয় দিবস। নিষ্ঠুর সকাল। সবাই নিষ্কৃপ, এক আকর্ষ সন্তাননায় প্রতীক্ষাত্ম। দুপুর বারোটা তখনও বাজেনি। বাড়ীর কাঙ্গের ছেলে শাহ আলম দৌড়ে এলো—‘দূরে জহ বাঞ্ছলা চিংকার শোনা যাচ্ছে।’ ওকে চুপ করতে বলি ইশারায়। আমার হাদকস্পন দ্রুত বাড়ছে, বাড়ছে। ভয়ে নয়, আনন্দে ও প্রত্যাশায়। তারপরই সামনের রাস্তায় এলো খোলা জীপ, সেই গাড়ীতে দাঢ়িয়ে বসে আমাদের মুক্তিপাগল রঞ্জন্মস্ত বিজয়ী দামাল ছেলেরা, আমাদের গর্বের ধন, আমাদের মূর্ত আকাঙ্ক্ষা। এক হাতে অস্ত্র শূন্যে তুলে ওদের প্রাণের উচ্চারণ ধ্বনিত হলো—‘জহ বাঞ্ছলা।’ চারদিকে তৎক্ষণাত্ম প্রতিরুপনি—‘জয় বাঞ্ছলা।’

আনন্দে বিস্ময়ে দেতালার বারমদায় আমি নির্বাক। চারদিকে এতো আলো! এত প্রাণের ধ্বাবন! এত আনন্দগান! এই দেশের মাটি এত উজ্জ্বল সবুজ! আমি এত ভালোবাসি এই

যাটি ! অস্তিত্বের অতল গভীর থেকে গুমরে গুমরে উথলে ওঠে আনন্দাশুর এক একটি দমকা ঢেউ ।

এমন সময় এক অস্তুত কাণ্ড । আমাদের দালানের এক ছেকরা যে কিনা দুদিন আগেও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচার হয়ে পাড়া কাঁপিয়ে তোলে, সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। কাঁধে একটি বন্দুক তুলেই হঁক দিল এই ছেকরা—‘জয় বাঙ্গলা’— তারপর সে মিশে গেল মুক্তিযুদ্ধের মিছিলে । ১৬ই ডিসেম্বরে সবার অলঙ্ক্ষ্যে এভাবেই গড়ে উঠলো মুক্তিযুদ্ধের ‘যোড়শ ডিভিশন’ ।

দোতলার বারান্দা থেকেই দেখা যায় মগবাজার রেললাইন। সেখানেও এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য । রেললাইন বরাবর তেজগাঁ মুখে ছুটছে পাক সেনার একটি দল। একের পিছনে এক। ঘাড়ে অশ্ব, হাতে বগলে বোঁচকা, টিনের বাত্র। পালাচ্ছে। সন্তুষ্ট। তবুও নিয়মমাফিক চলা। ডিসিপ্লিনড়। পৃথিবীর তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জওয়ান। আঞ্চলির ফিরেশতা নাকি ওদের পক্ষে লড়াই করে। অর্থ দুর্জয় ধাঁটি বাঞ্চালার মাটিতে ওদের কি হাল। আশেপাশের হাসি ও চিংকারে ওদেরই কেউ কেউ ভয়ে হোচ্চট খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ছে আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে ওদের বোঁচকার টুকিটাকি ।

বিকেল নাগাদ আকাশে হেলিকপ্টার বহর। একটু পরেই স্বাক্ষরিত হবে আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল। আমরা স্বাধীন। ক্রীতিদাসের মতো আর মাথা হেঁটে নয়, ধূকে ধূকে মরণ নয়, এখন আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের শৈর্ষিত নাগরিক এবং এই দেশের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ মায়ের অঙ্ক, লক্ষ লক্ষ শহীদেন্ত রক্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষের অপরাজেয় শক্তি ও সাহস সংযোজিত। এক একবার মনে হলো, একবার ছুটে যাই, ওই মাটির উপর নতজানু হয়ে লুটিয়ে পড়ি, চিংকার করে আল ফাটিয়ে বলি, মাগো তোমার কোলে ঠাই নেবার কোনো অধিকার নেই আমার, স্বাধীন চোখের জল মোছাতে আমি কিছুই করতে পারিনি, আমি এক ঘণ্টি ক্রীতিদাস ।

তবুও স্বাধীনতার ঢেউ এসে লাগে আমার মনে প্রাণে অস্তিত্বে। সেই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবার উদ্দেশ্যেই, ছাটো বেন জ্যোৎস্নাকে ডাকি টেলিফোনে। ‘কিন্তু আমরা স্বাধীন, আমরা বিঁচে আছি’ এই কথাগুলি বলতে না বলতেই আবার কান্নার দলা গলায় পাকিয়ে যায়। তারপর এক প্রচণ্ড আবেগের তোড়ে ঝরবর কেঁদেই ফেলি ।

আমরা অনেকে যেমন স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ায় ভাগ্যবান, তেমনি অনেকে, অনেক কাছের মানুষ আবার সেই বিজয় উৎসবের মাঝেই হারিয়ে গেলেন হঠাৎ। আসলে ঢাকা শহর তখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শক্রমুক্ত নয়। এখানে ওখানে ঘাতক সেনার পকেট। তাদের অতর্কিত গুলিতে নিহত হলেন আমার আত্মীয় এবং প্রায় সমসাময়িক ভাঙ্গার ডোরা। নানা চাচা সৈয়দ মনসুর জিলানী টেলিফোনে জানালেন সেই বর্ষের আক্রমণের বিবরণ। গাড়ীর ড্রাইভারও নিহত। শুধুমাত্র ডোরার খালু প্রকোশলী হাতেম আলী খান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমাদের বেবী ফুফু গুরুতর আহত হয়ে কোনো মতে প্রাণে বিঁচে গেছেন। বিজ্ঞেয়ের নির্ভেজাল আনন্দ উল্লাসে এবার একে একে জমতে লাগলো স্বজন হারানোর বেদন। স্বাধীনতার জন্য আরো কত রক্ত চাই কে জানে ?

পরদিন সকালে বাসার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্দু সাধাদিক মাহমুদের পথ ঢেয়ে আছি, এমন সময় পাশ কাটিয়ে গেল মুক্তিবাহিনীর একটি জীপ, স্টিয়ারিং ভাইলে তরুণ

অফিসার। আমাদের পরম্পরের চোখে চোখ পড়তেই জীপের চলা থামলো, তারপর কিছুটা ব্যাক গিয়ারে চলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো সেই গাড়ী। আরোহী তরুণ মুক্তিযোজ্ঞ প্রশ্ন করলেন :

‘আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করেন না।?’

‘হ্যাঁ—আপনি?’

‘আমার নাম সেলিম। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র আমি। কালচারাল ফাংশনের ব্যাপারে আপনার কাছে ক’বার গেছি আমরা।’

‘ও তাই তো, তাই এত চেনা চেনা লাগছে।’ গবে আমার বুকটা তখন দশ হাত। রাজশাহীর একজন ছাত্র এত বড় মুক্তিযোজ্ঞ। আমি বললাম :

‘আমাদের মুক্তির জন্য তোমরা এত করলে, আমরা কোনোদিন এ খণ্ড পরিশোধ করতে পারবো না। তোমরা গর্বের ধন, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।’

সবিনয়ে বিদায় নিলেন তরুণ মুক্তিযোজ্ঞ। কিন্তু এত লড়াই করে বিজয়ী হয়েও শেষ মুহূর্তে ওই ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারালেন এই বীর তরুণ।

শহীদ হন দিন পর ৩১ জানুয়ারি ৭২-এ মীরপুর বাবো নম্বর সেকশনে এক অপারেশন পরিচালনার সময় শহীদ হলেন তিনি। তারপর ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর লাশ পাওয়া গেল মীরপুরের এক ঝোপে।

শহীদ লেঃ সেলিমের আরো পরিচয় প্রকাশিত হলো সংবাদপত্রে। বাবা ডঃ এম. এ. শিকদার, মা সালেমা খাতুন, বাড়ী বরিশাল। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সেলিম একাত্তরের এপ্রিল মাসেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর ছোট ভাই আনিসও মুক্তিযোজ্ঞ।

সেই সতেরোই ডিসেম্বর, সেদিনের সেই অনুভব, সেই বিজয় উল্লাস হয়ত আর কোনোদিন ফিরবে না আমাদের জীবন্তে। ঢাকার এখানে ওখানে তখনো ঘাতকের পকেট, ডেরা। তবুও রাজপথে জনসমূহ একটি গাড়ীতে আমরা তিনজন। আমার দুই সাংবাদিক বকু-কে. বি. এম. মাহমুদ ও রেজাউল হক বাছু এবং আমি। শহরময় ছুটে বেড়াচ্ছি আমরা। অজস্র ছবি তুলছেন বন্ধুরা। চারদিকে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিস্ফোরণ, হিমালয় শীর্ষের মত শির উঠিয়ে একটি অপরাজেয় জাতির অভ্যন্তর।

পথে পথে কত পরিচিত মুখ, কত স্বজন, কত বন্ধু। হাজার হাজার বছর পর যেন এক জ্ঞানস্তরে পরম্পর দেখা। বুকে জাপাটে ধরেও প্রাণের সবটুকু উত্তাপ নিওড়ে দেওয়া যায় না। সেদিন ধানমণি এলাকায় একটি বাসার সামনে একমুখ দাঁড়িগোফ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাসান ভাই—হাসান হাফিজুর রহমান। ন মাস আত্মগোপনের পর সেই তাঁর প্রথম প্রকাশ। কে জানতো সেদিন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁর এই বাঁচা।

সতেরোই মধ্যদুপুরে আবার সবার মনে ক্ষেত্রে আগুন। সিভিল সার্জেন্ট এ. আর. চৌধুরীর বাড়ীতে সবচু আমি। আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত। বুজিজীবী হত্যার খবর একে একে আসছে আর ক্ষেত্রে বেদনায় ফেটে পড়ে সবাই। একাত্তরের সবচেয়ে মর্মান্তিক এই দুঃসংবাদে তেতো বিশ্বাদ হয়ে গেল আমাদের বিজয় আনন্দ।

সেই কাল বছর একাত্তর শেষ। বাংলাদেশের জীবন যাত্রা ধীরে ধীরে তখন ফিরে পাছে

তার স্বাভাবিক গতি। সরকারী পরিবহন চালু হতেই আমি রাজশাহীর পথে নেমে পড়ি, কোচে।

দারুণ ঝকঝকে সেই দিন। সোনা সোনা রোদ চারদিকে। আশ্চর্য সবুজ মাঠ গাছ পালা। প্রশান্ত নদী। চোখ মেলে দেখাই হয়নি এ্যান্ডিন এমন একটি সুন্দর দেশ। পথে পথে তখনও অবশ্য যুদ্ধের অঞ্চল স্বাক্ষর—ধৰ্মসে ভাঙা পোড়া বাড়ী। তবে কদিন আগেই যে এই দেশের মাটিতে এক নদী রক্ত প্লাবিত, এমন অনুভব কই? চারদিকে নতুন জীবনের স্পন্দনে মনেই হয় না এই ভূগুণ সদ্য রক্ষণাত, এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাগত প্রজন্মের ভবিষ্যৎ রচনার উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমানকে বলিদান করে গেছে, এই দেশের লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভব লুঠিত, লক্ষ লক্ষ শিশু এই সেদিন কঠিয়ে মরেছে এই মাটিতে। কি স্বার্থপুর, কি স্বার্থপুরের মতো এই মাটিতে বেঁচে আছি আমরা!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কেন জানিনা, কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কোচ দাঁড়ালো নাটোর কলেজ গেটে। ওই সময়ে কলেজ প্রাঙ্গণে দখলদার পাকসেনারা বন্দী। যুদ্ধবন্দী, তাই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী সুবিধাভোগী। ওদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত। কোচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওদের চলাফেরা। কেউ এদিক ওদিক হাঁটছে, কেউ কল খেকে জল তুলছে, কেউ কেউ একত্রে জটলা পাকিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। চিড়িয়াখানার বাঘ দেখে অনেক শিশুরা যেমন মজা করে, পাকিস্তানের হিংস্র জওয়ানদের এমন বন্দী দেখে দুইমিতে মাতলো কোচের কঙ্কন তরুণ সহযাত্রী। কিন্তু ঘৃষি ও বুড়ো আঙ্গুলের বিভিন্ন মুদ্রায় প্রকাশ করলো তাদের মনোভাব। এই বিপুল ট্রেইঞ্জিট লক্ষ্য করতেই পাঁচিলের কাছে এগিয়ে এলো কয়েকজন যুদ্ধবন্দী, তারপর তারা চিংকার করে উঠলো—‘হ্ম ফির আয়েসে, হ্ম ফির আয়েসে’। হো হো কয়েকসে ওঠে কোচের সকল যাত্রী, ভাবধানা: আর তোমরা ফিরতে পারছো না, তেজুর গৃষ্ঠির পিণ্ডি চটকে দেওয়া হয়েছে, এই বাঙ্গলার মাটি যে দুর্জয় ধাটি তেমনোর মতো দুর্ব্য স্টো ভালো করেই বুঝে নিয়েছে। অথচ তখন কে জানতো ইতিহাসের বীকা চোরা গলি পথে কত ভাবেই না ফেরা যায়।

একাত্তর অক্টোবর শোষে নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাক্ষাত্কারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বললেন, শেখ মুজিবকে যদি পূর্ব পাকিস্তানে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানকার জনগণই তাঁকে হত্যা করবে। কি উদ্দেশ্যে এই ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত, অর্থ কি অমোগ এই ব্যক্তি! ইয়াহিয়া খান নিশ্চয়ই তাঁর আশেপাশের পা চাটা বাঞ্ছলি চামচ দেখে বাঞ্ছলি জাতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পোষণ করতেন, বাঞ্ছলি গান্দার। তাই এমন সহজে বাঞ্ছলি জাতিকে পিতৃহন্তা বলেও ভাবতে পারেন তিনি। কি আশ্চর্য এই মূল্যায়ন! নাটোরে যুদ্ধবন্দী পাকসেনাদের সেই চিংকারকে এখনও আমার কানে লেগে—‘হ্ম ফির আয়েসে’। এই চিংকারকে সেদিন যে সহযাত্রীরা উপহাস করেছিল, তারা আজ কোথায়? ‘হ্ম ফির আয়েসে’— এখন বুঝতে পারি কতভাবেই না ফিরে আসা যায়। ধর্মীয় রাজনীতির পোশাকে সাম্প্রদায়িকতার সড়ক বেয়ে ফিরে আসা যায়, কিংবা নতুন খাকী বোতলে পুরোনো মদ ঢেলেও ফিরিয়ে আনা যায় সেই হারানো দিন, সেই হারানো সালতানাত। এখন আমাদের পরিচয় সংকট। আমরা আগে বাঞ্ছলি, না আগে মুসলমান এই বিতর্কে অধীমাণসিত। আমাদের প্রতিহ্যের মূল শিকড় মাটির নিচে না বালির নিচে, তা নিয়ে কত

আত্মানুসন্ধান কর সংশয়। তাই পাকসেনাদের স্বশরীরে ফেরা সম্ভব না হলেও তাদের প্রেতাত্মা আমাদের সাম্প্রদায়িক দষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উপস্থিত।

দেশ স্বাধীন হতেই ভোজবাঞ্জির মতো পাস্টে গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দশ্যপট। কোথায় সেই দখলদার বাহিনী। কোথায় তাদের পদাতিক ও গোলন্দাজ ডিভিশন। প্রাণ্যক্ষ ভবনে এখন মুক্তিবাহিনীর মেজর গিয়াস। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তাঁবু টেনিস কোর্টে। নিদিষ্ট তাদের দায়িত্ব : বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার এখানে সেখানে মাটির নিচে পাকসেনা কর্তৃক পেঁতা মাইন উক্ফার ও নিষ্ক্রিয়করণ। এক মহা দুর্বলতের গল্প শুনেছি। গ্রামবাসীদের হত্যার দায়ে ফাঁসাবার মতলবে সে নাকি তার মৃত্যুর পর তার লাশটি চৌরাস্তাৰ মোড়ে বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখতে বলেছিলো। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল ছেড়ে যাবার আগে ক্যাম্পাসের শিক্ষক ছাত্রছাত্রী কর্মচারীর দুটিনাঞ্জনিত আকশ্মিক মৃত্যুর শত শত ফাঁদ পেতে গেল। এটাই ছিল তাদের শেষ কামড়ের প্রচেষ্টা। একেবারে নিষ্কল ছিল না এত সাধনা। একদিন বাবুল নামে এক বালক মারাত্মক আহত হলো যে মাসে, আর একদিন একটি গুরু মরলো। মেজর গিয়াস যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজের কাছে থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়ে চলে যান, ঠিক সেইদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি ঈশ্বরদি বিমান বন্দরে যাই। ফেরার পথে বিড়ালদহ পার হতে না হতেই দারুণ ঘড়। পথের পাশে গাছগাছালি উপত্যে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। বেল পুরুর রেল ক্রসিং পোছে দেখি পথের পাশে লুকানো মাইন ফেটে এক লোকের একটি পা উড়ে গেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতেই আইত মানুষটিকে মেডিকাল কলেজ হসপাতালে নেওয়া হলো। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী সারা বাঙলাদেশেই নানা বিপদজ্জনক ফাঁদ পেতে গেছে। সময়ের ব্যবধানে সেই ফাঁদের শুধু রুক্ষফোর হয়েছে। আর সেই ফাঁদে আজ পতিত মৃত্যুদণ্ডের চেতনা ও আদর্শ। পথে প্রাণ্যক্ষের পুতো যাওয়া বিশ্বেফারক না হয় তখন নিষ্ক্রিয় করা গেছে, কিন্তু জ্বারজ মনের বিষ উপত্যে দেবে কে?

দীর্ঘ নয় যাস খবর চলাচলের মুখ বক্ষ থাকার পর হঠাতে খুলে যেতেই চারদিক থেকে ভিড় করে আসে হাজার হাজার ধূংসের বিবরণ ও স্বজ্ঞন হারানোর সংবাদ। যতই শুনি ততই স্তুতি। আকেশ আর ঘৃণা জমে মানুষের মনে, প্রতিশোধের আগুন জ্বলে— বিচার চাই, গগহত্যার বিচার চাই, নারীকীয় ধৰ্ষণের বিচার চাই, সম্পদ লুঠনের বিচার চাই। রাষ্ট্রপতি আবু সাম্বুদ চৌধুরীও বারবার আশ্বাস দিলেন, ‘এ দেশের মাটিতেই পাকিস্তানী নরপতি ও তাদের ঘৃণ্য দালালদের বিচার হবে।

আবার অন্যদিকে দালাল আইন বাতিলের দাবী জানালেন কতিপয় মহানুভব রাজনৈতিক মেতা।

ভাইস চান্সেলরের টেবিলের দেরাজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধাদিকেরা পেলেন একটি কাগজ। সেখানে সীইতিশ জন শিক্ষক ও দুজন কর্মকর্তার নাম। এই তালিকার নামগুলি আবার চার ভাগে সাজানো। এ তালিকার রহস্য কি, ভাইস চান্সেলরের স্টেনো তৈয়ব আলীকে জেরা করতেই বেরিয়ে এলো সে কথা। ভাইস চান্সেল ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এই তালিকা প্রস্তুত করে সামরিক দফতরে পাঠান এবং ওই চার ক্যাটিগরির অর্থ চার রকম দণ্ডের নির্দেশ। যেমন প্রাণদণ্ড, জেল, চাকুরী থেকে বরখাস্ত ও পশ্চিম

পাকিস্তানে বদলী। এই দণ্ডপ্রাণ ব্যক্তিরা ছিলেন : প্রথম ক্যাটিগরি—যতহাকুল ইসলাম (বাঙলা), গোলাম মুরশিদ (বাঙলা), জুলফিকার মতিন (বাঙলা), মফিজউদ্দিন আহমদ (দর্শন), মোশাররফ হোসেন (অর্থনীতি), সন্তুষ্মার সাহ (অর্থনীতি), খালিদ হাসান (সমাজ বিজ্ঞান), আব্দুর রাজ্জাক (সমাজ কর্ম), এবনে গোলাম সামাদ (উচ্চিদ বিদ্যা) ও কাজী সালেহ আহমদ (পরিসংখ্যান)। দ্বিতীয় ক্যাটিগরি— আব্দুল খালেক (বাঙলা), আব্দুল হক (আইন), আব্দুল হাফিজ (বাঙলা), অসিত রায় চৌধুরী (ইংরেজী), কাজী আব্দুল মান্নান (বাঙলা), সুমীল কুমার মুখোপাধ্যায় (বাঙলা), রমেন্দ্র নাথ ঘোষ (দর্শন), ফররুর খলিল (গণিত), সুব্রত মজুমদার (গণিত), শিশির কুমার ভট্টাচার্য (গণিত), আ. ই. ঘ. মনিরুজ্জামান (ভগোল), অঙ্গিত কুমার ঘোষ (অর্থনীতি) ও এম. এ. রকীব (ফলিত পদার্থ)। তৃতীয় ক্যাটিগরি—আলী আনোয়ার (ইংরেজী), শেখ আতাউর রহমান (বাঙলা), সফর আলী আকবর (ইতিহাস), আব্দুল গনি (ইতিহাস), আমীরুজ্জামান (ব্যবস্থাপনা) ও এ. বি. এম. মোশাররফ হোসেন (ইসলামের ইতিহাস)। চতুর্থ ক্যাটিগরি—এ. এফ. সালাহউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), মনোয়ার হোসেন (পরিসংখ্যান), ফজলুল হালিম চৌধুরী (ফলিত রসায়ন), জিজ্ঞাসুর রহমান সিদ্দিকী (ইংরেজী), এ. এম. ইউসুস (উচ্চিদ বিদ্যা), কায়েস উদ্দিন (ফলিত রসায়ন), সামসুল হক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ও কাজী হাসিবুল হোসেন (সমাজ বিজ্ঞান)। এছাড়া এই তালিকায় ছিল মাত্র দুজন কর্মকর্তার নাম : নাজিম মাহমুদ (পাবলিক রিলেসেন্স অফিসার) ও মোজাহার হোসেন (ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার) এবং সেখানে বিশেষ নির্দেশ যে কর্মকর্তাদ্বয় দ্বিতীয় ক্যাটিগরির ভূত্ত।

এই তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশের পিছনে আমার কোনো বাড়তি উৎসাহ কিংবা তৎপরতা ছিল না। এই তালিকার প্রেতে স্পষ্টকৈ নতুন করে জানার কিছীবা ছিল ! দেশ শক্তিমূলক হ্বার পরপরই ডঃ হোসায়েনের সাথে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাঁক্ষণিক উত্তেজনায় যে দুর্ব্যবহার করেছে, যিন্যে সুস্থ রচিত মানুষের কাছেও তা অনভিভেত। কেউ তা চায়নি। কিন্তু ঘটনার স্মৃতি তখন অন্য রকম।

ডঃ হোসায়েন প্রগৌতি 'দৃঢ়কৃতকারীদের' এই তালিকা প্রকাশিত হ্বার পর আমার শুরুজেয় শিক্ষক প্রফেসর জিজ্ঞাসুর রহমান সিদ্দিকী একদিন আমাকে বললেন : 'ডঃ হোসায়েন নিচয়ই রক্ত পিপাসু ছিলেন না, আর তা হলে তোমার আজ বেঠে থাকার কথা নয়। তাঁর প্রতি তোমার কৃতস্ত্র ধাক্কা উচিত।' হ্যত তাঁর দাঁষ্টিকোণ থেকে সে কথাই সত্যি। একই মানুষ একই ঘটনা একই সময় কালকে আমরা এক একজন কতভাবেই না দেখি। প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থান তার কাছে ধ্রুব। সুতরাং সেখানে তর্ক কিংবা প্রতিবাদের অবকাশ নেই। আর সত্তিই তো আমরা এক একজন কেমন করে একাত্তরের এক একটি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর অতিক্রম করেছি, তা আজো সকলের বিস্ময়। একাত্তরের যে কোনো দিনই আমাদের জীবনের শেষ দিন হতে পারতো। তা হ্য নি। আর হ্যনি বলেই আমি অন্ততঃ একাত্তর উত্তর কালকে আমার জীবনের নতুন মেয়াদ বলে জ্ঞান করি।

স্বাধীনতার পর ক্যাম্পাসত্যাগী কলকাতা প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষকেরা একে একে ফিরতে লাগলেন। এক এক সন্ধ্যায় ক্লাবে এক একজনকে পাই। পুনর্মিলনের আনন্দে সবাই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধৰি। এই মানুষেরা দেশের জন্য কর্ত কষ্ট কর্ত ত্যাগ কর্ত লড়াই করেছেন বলেই না আজ আমরা এই বন্দী শিবিরের মানুষেরা নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি।

সীমান্তের উপারে স্থায়ীনতার যুক্তি কে নানাভাবে যুক্ত ছিল, কে শাহজাদা আর্দির পাঞ্জাবী পরে চারপাশে ফুরফুর আতর গঞ্জ ছড়িয়ে সুরম্য এলাকায় ফুর্তিতে মন্ত ছিল, কিন্তু কে সাধের পাকিস্তানে ফেরার জন্য ব্যাকুল ছিল— ইসব তথ্য তলিয়ে দেখার কথা অনে হয়নি তখন। আমাদের কাছে সবাই তখন মুক্তিযোড়া, বীরসৈনিক। যেমন দেশত্যাগী অনেকের কাছেই আমরা ছিলাম দালাল, রাজ্ঞাকার। একদিন এ রকম ধারণার প্রকাশও পেলাম। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ফররুখ খলিল উদার মতবাদের শিক্ষক। ডঃ হোসায়েন প্রীত দৃষ্টত্বকারীর তালিকার দ্বিতীয় ক্যাটগরিতে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত। কলকাতা থেকে তিনি ফিরতেই আমি একটু বেশী আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর হাতে হাত মেলাতে গেলাম। ডঃ খলিল হাত গুটিয়ে নিলেন। আমি অপ্রস্তুত। ডঃ খলিল হেসে বললেন : ‘আমরা সব খবরই রাখি, এখনে আপনি কি করেছেন না করেছেন সবাই জানি।’

‘তাই?’ আমি আর কথা বাঢ়াতে পারলাম না।

‘যান যান তাড়াতাড়ি বাড়ী যান, সক্ষে হয়ে গেছে, মুক্তিবাহিনী এসে পড়তে পারে।’ আমার সাথে একটু মশকরা করলেন ডঃ খলিল। দিন তিনেক পরে আমার অফিসে আবার এলেন ডঃ খলিল। তাঁর হাত প্রসারিত, মুখে হাসি। আমার মনের বাষ্প এক মুহূর্তে উড়ে গেল।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে মাইনমুক্ত করার পর শহীদ জোহা হলের পূর্বে অবিস্কৃত হলো একের পের এক গণ কবর। দেখা গেল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাদেশের সর্ববহুৎ ব্যক্তিমূল্য, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিপ্রাট অংশ জুড়ে তার ব্যাপ্তি।

২৩শে এপ্রিল ৭২ তারিখে হার্টকালচার স্টোর্মের দক্ষিণে একটি বিশাল গণকবর যেদিন আবিষ্কৃত হলো, সে এক মর্মান্তিক দণ্ডে এক একটি করোটি উঠছে, পাশাপাশি সাজানো হচ্ছে। আশে পাশের গ্রামের হাজুর হাজার মানুষের রুক্ষ নিঃশ্বাস। অবিশ্বাস্য এই দণ্ড। চোখ যেন ফেটে পড়তে চায়। এভাবে খুড়তে খুড়তে কি সারা বাঙলাদেশটাই খুড়ে ফেলতে হবে ! মানুষ খেকে পাকসেনারা কি করে গেছে !

অবশ্য এই গণ কবর আবিষ্কৃত হবার আগেই ১৪ই জানুআরি তারিখে বোয়ালিয়া থানার কাছে এক ফাঁকা জমিতে পাওয়া গেছে ছাট তরুণ ছাত্রের লাশ। আলবদর বাহিনীর এই নশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আমিনুর রহমান (প্রথম বর্ষ, বাড়ী ফরিদপুর), তোজাম্বেল হক (প্রথমবর্ষ, বাড়ী পাবনা), শওকত রেজা (দ্বিতীয় বর্ষ, বাড়ী পাবনা), রাজশাহী সরকারী কলেজের আব্দুল মামান (দ্বিতীয় বর্ষ ইংরেজী সম্মান, বাড়ী রাজশাহী), পলিটেকনিক ইনসিটিউটের মহম্মদ ইয়াকুব (দ্বিতীয় বর্ষ, বাড়ী রাজশাহী) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ আলী (তৃতীয় বর্ষ অর্থনীতি সম্মান, বাড়ী পাবনা)। খবরাখবরে জানা গেছে বোয়ালিয়া থানার কাছেই এক বাড়ীতে এদের জবাই করা হচ্ছে। লাশগুলির প্যাটের পকেটে ছিল তাঁদের আইডেন্টিটি কার্ড। ডাক্তি কার্ড ছাড়া চলাফেরা বিপদজ্জনক, তাই। সর্বাত্মক মুক্ত শুরু হতেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আকস্মিক ভাবে বক্ষ ঘোষণা করে আবাসিক হল ত্যাগ করতে বলা হলো ছাত্রদের। বাড়ী ফেরার তাড়ায় যখন সবাই দিশেহারা, তখন তারা জানতেও পারেনি আলবদর অস্ত্র হাতে তাঁদের পিছনে পিছনে ফিরছে। মহম্মদ আলীকে খুব সম্ভব ধরা হয় ১২ই ডিসেম্বর, সাহেবে

বাজার বাস স্ট্যাণ্ডে, প্রকাশ্য দিবালোকে। তাঁর একমাত্র অপরাধ, স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের শ্রোতা সে। জিম্মাহ হলের আবাসিক আলবদর ছাত্র সেপাইয়া জানতো এই গোপন তথ্য।

দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতির নিষ্ঠয়তার দোহাই পেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একদিন ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ডাকলেও চরম এক দুস্ময়ে তাদের হল ত্যাগে বাধ্য করে। দেশের চলচল তখন বিস্তৃত, কোথাও নিরাপত্তা নেই, পায়ে পায়ে বিপদ মত্তু। আবাসিক হল ত্যাগে বাধ্য না হলে হয়ত মহম্মদ আলীর এই পরিণতি হয় না। মহম্মদ আলীর লাশ শনাক্ত হবার পর তাঁকে শেরে বাঙলা হল প্রাঙ্গণে দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি গলিত পচা লাশের জন্য একটি কফিন দরকার। যুজ্ব বিধ্বন্ত দেশ। কোথাও কিছু মেলে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামসূল হক ও আমি শহরে কফিনের জন্য ঝোঁজাখুঁজি করছি, সোনাদীরির উত্তর মোড়ে এক ছাত্র সাথে দেখা, মহম্মদ আলীর বন্ধু। তার কাছেই শোনা গেল মহম্মদ আলীর ধরা পড়ার বিবরণ। আলবদর বাহিনীর হাত থেকে মহম্মদ আলীকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তার দুজন বন্ধু অংশনীতি বিভাগের প্রধান ডঃ সোলায়মান মণ্ডল, ভাইস চাম্পেলর ডঃ বাবী ও আইন বিভাগের প্রধান ডঃ জিলুর রহমানের কাছে তাবির করে। নিষ্কল। ডঃ মণ্ডল লাশ দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, মহম্মদ আলীর জন্য কিছু করা সম্ভব হয়নি। কেন, সে প্রশ়ি অবাস্তর। মহম্মদ আলীর দাফন সম্পন্ন হলো শেরে বাঙলা হলপ্রাঙ্গণে আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনজন ছাত্রকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হলো কলেজ মেইন গেটের পশ্চিমে।

যত দিন যায় হত্যা লুটন ধৰ্মের নতুন মতুন তথ্য বেরিয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ কর্ম বিভাগ পরিচালিত এক অনুসংজ্ঞানে পাওয়া গেল তয়াবহ তথ্য। এই সব কারণে সদ্য স্বাধীন দেশে যুজ্ব ফেরতা ছাত্রদের স্মৃতি ও ছিল দারুণ উত্তেজনা— রক্তের বদলে রক্ত চাই, এমন একটা ভাব। নবনিযুজ্ব ভাইস চাম্পেলর খান সারওয়ার মুরশিদের উপর প্রচণ্ড চাপ, দালাল শিক্ষকদের বিচার চাই। ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো এক সভায় যখন এই দাবী ফেটে পড়লো, প্রফেসর মুরশিদ একেবারে সরাসরি ঝুঁকে দাঁড়ালেন : ‘আর কত রক্ত চাই, আর কত রক্ত ঘরবে এ দেশের মাটিতে? আর হত্যা নয় আর ধৰ্ম নয়, এবারে –’। ছাত্রা কিন্তু মনে মনে দারুণ বিস্কুট। ওদের এক নেতা আমাকে বললো— ‘আপনার স্যারকে বলে দেবেন, উনি বঙ্গবন্ধুর মনোনীত, কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের মনোনীত। সুতরাং দাবী না মানলে সব ধরে টান দেব, টেবিল উঠে যাবে।’

কিন্তু ভাইস চাম্পেলর প্রফেসর মুরশিদ অটল। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে এসেছেন, হত্যা ও প্রতিশোধের রাজনীতি উস্কে দেবার জন্য এখানে আসেননি। তিনি শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তিনি মেধা ও মননের মূল্য দিতে চান, দলাদলির রাজনীতি তাঁর লক্ষ্য নয়। প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদের এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারনীতি কিন্তু স্থানীয় আওয়ামী লীগ মহলে প্রশ়্না কিংবা প্রশ়ংসা পেল না।

একাত্তর একশুলে এপ্রিল মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় দখলদার বাহিনী। প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ ও স্বাধীনতা উত্তরকালের ছাত্রনেতৃত্বদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাহস প্রত্যয় ও বাংলাদেশের চার ঘোল আদর্শের প্রতীক হয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো স্মৃতির স্তম্ভ শহীদ মিনার। ছাবিশে

বৈশাখ তেরশ উনাশি (৯ই মে '৭২) এই মিনারের ভিত্তি স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৯ই বৈশাখ তেরশ বিরাশি (২৩ এপ্রিল '৭৫) এই মিনার উদ্ঘোষণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী। শহীদ মিনারের সাথে যুক্ত এই দুই বাট্টিও পরবর্তীকালে শহীদ হয়ে গেলেন। এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ছিল কি সেই ঘটনা? মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপনের এক পক্ষকালের মধ্যে রাতের অক্ষকারে কে বা কারা ভিত্তিগ্রন্তির ফলক থেকে ঝুঁড়ে উপড়ে দিল 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি। তখনও সাবধান সচেতন হতে পারিনি আমরা। তখনও উপলব্ধি করিনি কেউ সেই চিরায়ত আপ্ত বাক্যঃ অতস্ম প্রহরাই স্বাধীনতার মূল্য।
